সীমন্তীর স্বপ্ন

শ্রীরমাপদ চৌধুরী

বিশ্ববাণী প্রকাশনী ॥ কলকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ :
জুলাই, ১৯৫৯

প্রকাশক :
ব্রজকিশোর মণ্ডল
বিশ্ববাণী প্রকাশনী
৭৯/১বি মহাত্মা গান্ধী রোড
কলকাতা-৯

মুদ্রাকর :
দিলীপকুমার চৌধুরী
সরস্বতী প্রেস
১২ পটুয়াটোলা লেন
কলকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী :
গৌতম রায়

সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন
সীমন্তীর স্বপ্ন

এই লেখকের :

যে যেখানে দাঁড়িয়ে

এখনই

লালবাঈ

রুমাবাঈ

পরাজিত সম্রাট

বন পলাশীর পদাবলী

পিক্‌নিক

পিয়াপসন্দ্‌

দ্বীপের নাম টিয়ারঙ

এই পৃথিবী পান্থনিবাস

প্রথম প্রহর

গোপাল কুণ্ডু রোডে রিকশাও ঢোকে না এমন নয়। তবে ওপাশের বস্তি এখনও উচ্ছেদ হয় নি বলেই রাস্তাটার অবস্থা প্রায় অন্ধ গলির সামিল। ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের একটা নতুন চওড়া রাস্তা চলে গেছে একটু দূর দিয়ে খানিকটা বস্তি ভেঙে দিয়ে। কয়েকটা নতুন নতুন বাড়িও নানা রঙের শোভা নিয়ে জোড়া জোড়া বে-উইণ্ডো খুলে দাঁড়িয়েছে। তারই আলো-হাওয়া খানিকটা ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছে গোপাল কুণ্ডু রোডে। আগে গৌরীদের বাড়িতে যে এসেছে সেই চিঠি লেখার সময় ঠিকানা লিখেছে গোপাল কুণ্ডু লেন। রাস্তা তারপর চওড়া হয় নি এক ফুট, কিন্তু এখন আর কারও ভুল হয় না। শেষ প্রান্তের বস্তির দর্মার আড়াল, টালির আর টিনের ছাদ, কিছুটা অভব্য চিৎকার-হল্লার জন্যেই যা লজ্জা। তা ছাড়া এমনিতে যে মোটরকার ট্যাক্সি ছোটে না বড় একটা, রিকশা ঢোকে না, সে একরকম ভালোই।

রিকশা কদাচিৎ দেখা দেয় এ-রাস্তায়, তাই দূর থেকে শাড়ির রঙটুকু দেখেই উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছিল সবাই।

মা'ও ভাবতে পারে নি গৌরী এসে হাজির হবে এ-সময়।

গীতা আর গায়ত্রী বলাবলিও করেছে দোতলা থেকে দেখতে পেয়ে।—কে রে! অ্যাডভোকেটদের বাড়ির কেউ নাকি?

অঞ্জলি আর আরতি বললে, মেজদি নয় তো?

জল্পনাকল্পনা চলতে চলতেই শ্যামল হাততালি দিয়ে উঠেছে, মেজদি, মেজদি আসছে!

মেজদির সঙ্গে শ্যামলের খুব ভাব। মা জানে। মা তাই স্নেহের চোখে শ্যামলের দিকে তাকালো।

একটি মাত্র ছেলে, তাও রোগাসোগা চেহারা, স্বাস্থ্য ভালো নয়। চোখে এর মধ্যেই পুরু চশমা উঠেছে। চশমার ফ্রেমটা আবার দিব্যি চওড়া। তাতে আরো রোগা লাগে। সরু সরু পা দু'খানা পায়জামা ঢাকা পড়েও সরু লাগে। এক সান্ত্বনা পড়াশুনোয় মোটামুটি ভালো। কিন্তু অত্যধিক পড়াশুনোর ফলেই বোধ হয় মুখে চোখে সদাসর্বদা ক্লান্তির ছাপ। কেমন একটা ভীরু ভালোমানুষ ভাব, একটু বা লাজুক লাজুক। মা বাবা বোনেদের সঙ্গেও ঘাড় কাত করে নরম নরম কথা বলে। শুধু মেজদি এলেই ওর ফুর্তি। কিন্তু ইদানীং, তা কেন, অনেক কাল থেকেই তো আসা-যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে গৌরীর।

অশোকা দেবী প্রথমটা তাই খুশী হয়ে উঠেছিলেন। ছেলের মুখের দিকে তাকিয়ে, তাকে ছুটে সিঁড়ির ধাপগুলো লাফাতে লাফাতে যেতে দেখে তাঁর ভরাট বয়স্ক মুখে একটা তৃপ্তির হাসি ফুটেছিল।

কিন্তু মুখের হাসিটা তাঁর যেমন একটু একটু উজ্জ্বল হয়েছিল তেমনি আবার একটু একটু করে নিভে গেল। দু'দিন আগে আলোগুলো যেভাবে সাদা ঝকঝকে থাকতে থাকতে হঠাৎ কেমন হলদে হয়ে গিয়ে ক্রমে নিস্তেজ লাল রঙের মধ্যে ম্লান হয়ে অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল, অশোকা দেবীর মুখের ভাবও তেমনি রঙ বদলাতে বদলাতে থমথমে হয়ে গেল।

মেয়ে আসছে বাপের বাড়িতে, বেড়াতে, হোক্ না দু'দণ্ডের জন্যে গল্প করতে, তা বলে খুশী হবে না মায়ের মন?

হয়েছিল।

'এই, ব্যস ব্যস!'

বলতে বলতে রিকশাটা দু'পা এগিয়ে গিয়েছিল, পিছিয়ে এসে বাড়ির দরজার সামনে দু'বার ঠুং ঠুং শব্দ করে থামলো।

রিকশার হাতল দু'খানা মাটিতে নামিয়ে রেখে একপাশে এসে অপেক্ষা করলো লোকটা। তারপর গৌরী নেমে পড়তেই সে স্যুটকেসটা নিতে গেল হাত বাড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গৌরী বলে উঠলো, থাক্, থাক্, তুমি এই নাও।

বলে পয়সা বের করলো ব্যাগ থেকে, ব্যাগটা আরো একটু ফাঁক করে এ-কোণ ও-কোণ খুঁজলো খুচরো কয়েকটা পয়সার জন্যে। তারপর হিসেব মিললো না দেখে আধুলিটাই দিয়ে দিলো।

রিকশাওয়ালা বেশী পেয়ে একটা সেলাম করলো বোধহয়। হাতটা একটু কপালের দিকে তুললো আর কি।

গৌরী ততক্ষণে স্যুটকেসটা নিজেই তুলে নিয়েছে। ভারী স্যুটকেসটা নিজেই তুলে নিয়ে যেতে পারতো দোতলা অবধি। নিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে ছিল।

কারও হাতে কিছু তুলে দেবে না। স্যুটকেস কেন, যতক্ষণ পারবে নিজেকেও বয়ে নিয়ে যাবে। না পারলে থেমে পড়বে। আরেকজনের হাতে তুলে দিতে চাইবে না।

একটা সেকেণ্ডের একশো ভাগের এক ভাগ সময়ে যেমন ক্যামেরায় একটা ছবি উঠে যায়, কিংবা সিনেমায় অনেকগুলো ছবি পর পর পার হয়ে যায়, তেমনভাবে কোনো একটা ভাবনা নয়, কোনো একটা দৃশ্য নয়—এলোমেলো অস্পষ্ট কয়েকটা রাগ, দম্ভ, অভিমান পরস্পরের সঙ্গে মিশে গেল গৌরীর মনের মধ্যে।

তারপর হঠাৎ কখন একটুকরো হাসি দেখা দিলো চোখের কোণে। ছোট ভাই শ্যামল এসে দাঁড়িয়েছে ওর সামনে, হাসি মুখে। শ্যামলের দিকে তাকিয়েই হয়তো হাসলো গৌরী।

শ্যামল ইতিমধ্যে ওর হাত থেকে স্যুটকেসটা ছিনিয়ে নিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ধুয়ে মুছে গেছে একটু আগের প্রতিজ্ঞা।

এদিকে এক রাশ বোন—নানা বয়সের, নানা মাপের—ছুটে এসেছে ফুর্তিতে।

একটু আগে ওরা সবাই দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিল। পাশে মা।

ঠুন ঠুন করে এ-রাস্তায় একটা রিকশা ঢুকতে দেখেই ওরা সবাই ভাবছিল, কে আসছে ? কাদের বাড়ি ! মুখটা তখনও স্পষ্ট হয় নি, শুধু শাড়ির রঙটা দেখা যাচ্ছিল। গাঢ় সবুজ।

গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়ে, ওপরের বারান্দা থেকে লক্ষ্য করেই, একটা সন্দেহ উঁকি দিলো মনে। এসে দাঁড়ালেন সিঁড়ির মাথায়।

শ্যামল ততক্ষণে মেজদির সঙ্গে গল্প জুড়ে দিয়েছে।—আজই ভাবছিলাম, কাল কলেজের ছুটি, তোমার ওখানে গিয়ে হাজির হবো।

গৌরী হাসলো শ্যামলের চপল প্রগল্ভ ভাব দেখে, কি যেন চাপা দেবার চেষ্টা করলো।

বললে, পড়াশোনা করছিস, না···

—ধুৎ। মেজদি তুমিও দেখছি বাবার মতো হয়ে গেছ।

গৌরী ঠোঁট টিপে হাসলো, কান মলে দিলো শ্যামলের।—আমি চলে যাওয়াতে খুব ফাঁকি দিতে শিখেছিস, না ? এবার দেখাবো।

মেজদির হাত থেকে কানটা ছাড়িয়ে নিয়ে পুরু চশমার ওধারে ওর চোখছুটো বড় বড় হয়ে উঠলো। ছু'হাতের আঙুলে চিমটের মতো পাজামার কাপড় ঈষৎ তুলে ধরেছে তখন স্যুটকেসটা সিঁড়ির ধাপে নামিয়ে রেখে। সেইভাবেই তিড়িং করে লাফিয়ে উঠলো।—আরি বাপ্। মেজদি তুমি থাকবে দিনকতক, না ? তাই ভাবছি···

গীতা আর গায়ত্রীও এসে জুটেছে পিছনে। গীতা হেসে উঠলো।—শ্যামল একটা বুদ্ধু হায়। থাকবে না তো স্যুটকেস নিয়ে আসবে কেন শুনি ?

গায়ত্রী আর অঞ্জলি দু'জনে গৌরীর কাঁধে ভর দিয়ে দাঁড়িয়েছে।—দিনকতক ?

গৌরীর থুতনিতে হাত দিয়ে অঞ্জলি বললে, না মেজদি, দিনকতক না, এক মাস, প্লীজ।

আরতি বললে, উঃ, কি মজা যে হবে তা হলে! মাইরি মেজদি, তা-ই, অঞ্জু যা বলেছে। এক মাস। আট দিন পরেই তো আমার ভ্যাকেশনের ছুটি হচ্ছে···কি মজা যে হবে!

গৌরী ধমক দিতে যাচ্ছিল, 'অঞ্জু' কি! ছোটদি বলিস না এখনো ?

কিন্তু তার আগে শ্যামলই ধমক দিলো।—সর্ সর্। চলো মেজদি, ওপরে চলো।

বলে স্যুটকেসটা হাতে তুলে নিয়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠে গেল। সিঁড়ির মাথায় মা দাঁড়িয়ে আছে। চোখোচোখি হতেই হাসলো শ্যামল, কিন্তু অশোকা দেবী হাসলেন না। শ্যামল কেমন একটু অস্বস্তি বোধ করলে, তারপর পাশ কাটিয়ে চলে গেল স্যুটকেস রাখতে।

গৌরীও ধীরে ধীরে ওপরে উঠে আসছে। চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। তবু মা'র পায়ের কাছটা, শাড়ির পাড়ে ঘেরা পা দু'খানা শুধু চোখে পড়ছে। তবু চোখ তুলতে কেমন অস্বস্তি।

এই মুহূর্তটার কথাই বার বার ভেবেছে গৌরী! লজ্জা, ভয়। এই মুহূর্তটার কথা ভেবেই এতদিন চুপ করে থেকেছে। আজ আর পারে নি।

গৌরী কাছে আসতেই অশোকা দেবী চেষ্টা করে মুখে হাসি আনলেন। চেষ্টা করেই প্রশ্ন করলেন, কি রে, হঠাৎ ?

গৌরী চোখ তুলে তাকালো মা'র মুখের দিকে। চোখ নামিয়ে নিলো সঙ্গে সঙ্গে। উত্তর দিতে বাধলো। তারপর থেমে থেমে বললে, আসতে নেই বুঝি!

মা যেন কি! গীতা গায়ত্রী কারও ভালো লাগলো না প্রশ্নটা।

কিন্তু ততক্ষণে মুখোমুখি হয়েছে গৌরী। আর ওর কপালে মাথায়—হ্যাঁ, সিঁথিতে চোখ পড়তেই মা'র বুকটা ছ্যাঁৎ করে উঠলো।

এমনভাবে ফিরে আসতে হবে, ফিরে আসবে, গৌরী নিজেই কি কোনোদিন ভেবেছিল!

সন্ধ্যে গাঢ় হয়েছে তখন, চিক-চিক-চিক করেকটা আলো জ্বলছে দূরে দূরে। বস্তির দিকের ল্যাম্পপোস্টটা শুধু এক-ঠ্যাঙে একা দাঁড়িয়ে আছে অন্ধকারে। রাতের টহলদার পুলিসের মতো। যেন জিরিয়ে নিচ্ছে খানিক। আলোর পাগড়ি নেই মাথায়। প্রায়ই থাকে না। কি এক রহস্য আছে ওই ল্যাম্পপোস্টের আলোয়। দু'দিন অন্তর লোক আসে, মই লাগিয়ে বাতি ঠিক করে, বাল্‌ব বদলায়, আলো জ্বলে ওঠে, তারপর হঠাৎ একসময় অন্ধকার হয়ে যায় অকারণেই।

গীতা আর গায়ত্রী আগে হেসে হেসে বলতো, ভুতুড়ে ল্যাম্পপোস্ট ওটা। নির্ঘাৎ কোনো প্রেতাত্মা ভর করে ওর ওপর, তাই আলো সহ্য করতে পারে না।

গৌরী হাসতো তখন। ও জানতো, রহস্য কি, রহস্য কোথায়।

ও জানতো বস্তির ওই-পাশটায় দু'একটা নিশাচরীর আড্ডা হয়ে ওঠে রাত হলেই। আর নিশাচরদেরই কেউ কি-ভাবে যেন আলোটা ফিউজ করে দেয়।

গৌরী আজও সেই অন্ধকার জগৎটার দিকে তাকিয়ে বসে ছিল। ছায়া ছায়া শরীর কয়েকটা মানুষের আনাগোনা, হাসি-ঠাট্টার ভঙ্গিমা আজও হয়তো চোখে পড়তো। কিন্তু আজ আর সেদিকে চোখ ছিল না গৌরীর, মন ছিল না।

ওর চোখে ছিল উদাস দৃষ্টি, মনের মধ্যে কেমন একটা নিঃস্বতা।

বারান্দায় একটা ফুলের টব, গাছটা শুকিয়ে গেছে। তার ওপরেই পা রেখে বসে ছিল ও। শ্যামল পড়তে বসেছে পাশের ঘরে। জানালার ফাঁক দিয়ে এক চিলতে আলো এসে পড়েছে, শ্যামলের টেবিল-লাইটের। এই বয়সেই পড়ে পড়ে চশমার কাচটা পুরু করে ফেলেছে ছেলেটা।

গীতা গায়ত্রী অঞ্জলি আরতি যে যার কাজে ব্যস্ত। মা রান্নায়। বাবা বাড়িতে নেই।

বিকেল কেটেছে দিব্যি হাসি-আনন্দ গল্প-গুজবে। মা অনেকক্ষণ কাছে ছিল। তারপর একসময় সবাই একে একে সরে গেছে।

গৌরী ভাবছিল কিছু, কিংবা কিছুই ভাবছিল না।

মাঝে মাঝে বোনদের দু'চারটে কথা হাসি ভেসে আসছে, আর শ্যামলের বই পড়ার গুনগুন আওয়াজ।

গৌরী টের পেয়েছে, মা বুঝতে পেরেছে। বুঝতে না পারুক, ভয়ঙ্কর কিছু একটা যে ঘটে গেছে সন্দেহ নিশ্চয়ই হয়েছে তাঁর।

তবু অশোকা দেবী কিছুই জিগ্যেস করেন নি। একটা কথাও না। হয়তো ভয় পেয়েছেন। যদি জিগ্যেস করে যা আশঙ্কা করতেন, আশঙ্কা করেন, তেমন কিছু শুনতে হয়।

বাবা সন্ধ্যেবেলায় ফিরে এসেই বেরিয়ে গেছেন ছেলে পড়াতে।

গৌরীকে দেখে খুশী হয়েছিলেন। তারপর চা আর দু'খানা রুটি খেলেন আলুর দম দিয়ে। গৌরী লক্ষ্য করলো সামনে বসে বসে। মনে পড়লো, বাবা আগে রুটি খেতে পারতেন না। পরোটা খেতেন। ঘিয়ের পর দালদা দিয়েও কিছুদিন খেয়েছেন। এখন নাকি ওসব হজম করার শক্তি নেই।

গৌরী কিছু জিগ্যেস করে নি, বলে নি কিছু। আর বাবারও মনে হয় নি গৌরী তাঁকে রুটি খেতে দেখে বিস্মিত হয়েছে। আসলে

বেশ কিছুদিন ধরেই তো রুটি খান আপিস থেকে ফিরে, তাই মনেও নেই পরোটা না হলে কবে কিভাবে ঝগড়া করেছেন স্ত্রীর সঙ্গে।

কিন্তু অশোকা দেবী হঠাৎ বুঝতে পারলেন। গৌরী অমন করে তাকিয়ে আছে কেন। তাই নিজে থেকেই বললেন, আজকাল ছ'খানা পরোটা হজম করার শক্তিও নেই।

—বুড়ো হচ্ছি তো।

গৌরী শুনলো কথাটা, বিশ্বাস করতে ভালো লাগলো না। তবু, নিচের তলাটা ভাড়া দেওয়ার সঙ্গে এর কোথায় যেন একটা সম্পর্ক আছে মনে হলো। ভাগ্যিস, ছোটখাটো এই বাড়িখানা দাছ তৈরি করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

—মনোরঞ্জনবাবু! নিচের তলার ভাড়াটে ভদ্রলোকের ডাক।

বাবা ওপর থেকেই কি যেন বললেন তাকে, তারপর চাটুকু শেষ করে বেরিয়ে গেলেন।

যাবার আগে কি ছ'একটা কথা হলো মার সঙ্গে। বাইরের বারান্দা থেকে কান পেতে শোনবার চেষ্টা করলো গৌরী। না, তার কথা নয়।

বাবা বেরিয়ে যেতে নিশ্চিন্ত হলো গৌরী। ভয় ছিল, বাবা হয়তো জিগ্যেস করবেন কিছু।

এখন আর ধারে কাছে কেউ নেই। দেয়ালে ঠেস দিয়ে টবের ওপর পা তুলে দিয়ে বারান্দার রেলিঙের ফাঁক দিয়ে তাই নিভে যাওয়া রাস্তার আলোটার দিকে, পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে ভাবছিল।

সত্যি, জীবনটা এমনভাবে এই বয়সে এমন একটা মোড় নেবে কে জানতো।

নিজের জীবনকে নিজেই গড়ে নিতে চেয়েছিল ও।

রঞ্জিৎকে বিয়ে করতে চায় শুনে সেদিন বাবা খুব রেগে গিয়েছিলেন। অথচ গৌরীর দোষ কি, বাবাই তো ওকে ধরে এনেছিলেন।

বন্ধুর ছেলে। খুব ভালো ফটো তোলে। একটা কোন্ সিনেমাতে নাকি কাজ পাওয়ার চেষ্টা করছে। বাড়ির নিচের তলায় স্টুডিও করেছে। চলছে ভালোই।

বাবা বলেছিলেন, দেখি রঞ্জিৎ, কেমন ছবিটবি তুলছো দেখি।

রঞ্জিৎ দেখিয়েছিল। নানা রকমের ভালো ভালো ছবি। পোট্রেট, সিনসিনারি।

দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন মনোরঞ্জনবাবু। বাঃ বাঃ, বেশ ফটো তোলো তো তুমি।

একটু থেমে বলেছিলেন, ছেলেমেয়েদের নিয়ে একটা গ্রুপ ফটো তোলাবো ভাবছি। এরপর তো সব মেয়েরা পর হয়ে যাবে একে একে। একসঙ্গে সবাইকে আর পাবো কিনা কে জানে। তাই ভাবছি·· ···

রঞ্জিৎ খুশী হয়ে বলেছিল, বেশ তো, যাবো একদিন, গিয়ে তুলে দেবো কয়েকটা······

—বড় মেয়েকে তা হলে খবর দেবো, তারও তো থাকা চাই।

খবর দিয়েই শ্বশুরবাড়ি থেকে গৌরীর দিদিকে আনানো হয়েছিল। তারপর রঞ্জিৎ এসেছিল একদিন ছবি তুলতে।

বেশ হাসিখুশি স্মার্ট চেহারার ছেলে।

সারি দিয়ে ওরা কেউ বাপ-মা'র পায়ের কাছে বসেছিল, কেউ তাঁদের পিছনে দাঁড়িয়েছিল।

আর গৌরীর মনে আছে বাবার হাত দুটো কিভাবে রাখতে হবে দেখিয়ে দিয়ে ফ্রক-পরা আরতিকে সামনে এনে বসিয়ে গৌরীকে পিছনে গিয়ে দাঁড়াতে বলেছিল।

তারপর দু'-তিনবার ক্যামেরাটা চোখের সামনে ধরে রঞ্জিৎ হঠাৎ এসে গৌরীর চিবুক ধরে মুখটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছিল।

বাবা মা কিছু মনে করে নি, শুধু গীতাটা আড়চোখে তাকিয়ে

হেসেছিল। আর রঞ্জিৎ ওর চিবুকে হাত দেওয়ায় ও যত না লজ্জা পেয়েছিল তার চেয়ে অনেক বেশী লজ্জা পেয়েছিল গীতার হাসি দেখে।

তারপর ছবি তোলা হয়ে যেতে সবাই একে একে যখন ছাদ থেকে নেমে আসছিল, কি ভাবে যেন গৌরী পিছিয়ে পড়লো।

আর তার পিছনে রঞ্জিৎ।

হঠাৎ ক্যামেরার চাবি টেপার শব্দে চমকে ফিরে তাকাতেই রঞ্জিৎ সেদিন মৃদু হেসেছিল। আর গৌরী বুঝতে পেরেছিল ওই সুযোগে গৌরীর একখানা ছবি তুলে ফেলেছে রঞ্জিৎ।

গ্রুপ ফটোখানার বেশ বড়ো একটা এনলার্জমেন্ট দিতে এলো একদিন রঞ্জিৎ।

বাবা তখনও আপিস থেকে ফেরেন নি।

গৌরী আর মা বারান্দায় দাঁড়িয়ে।

রঞ্জিৎকে আসতে দেখে মা বললেন, দেখতো গৌরী, মহিমবাবুর ছেলে বোধহয় ফটো নিয়ে এসেছে।

গৌরী ছবি দেখার আগ্রহেই ছুটে এলো নিচে।

খুব সাধারণ সাদামাঠা একখানা ফোটোগ্রাফ।

গৌরী ছবিখানা হাতে নিয়ে বলেছিল, খুব সুন্দর হয়েছে।

রঞ্জিৎ হেসেছিল।

আর গৌরী হঠাৎ বলেছিল, আমার ফটোটা?

প্রথমটা একটু থতমত খেয়ে রঞ্জিৎ উত্তর দিলে, সেটা শুধু আপনাকেই দেবো।

কথাটার মধ্যে কি একটা দুষ্টু অর্থ ছিল বোধহয়। তাই গৌরী অস্বস্তি বোধ করলে।

গৌরী মুখ নিচু করে বললে, কবে?

—কলেজ থেকে ফেরার পথে নিয়ে আসবেন। আমি তো নিচের ঘরেই স্টুডিও করেছি।

গৌরী কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই গীতা আর গায়ত্রীও মা'র কাছ থেকে খবর শুনে ছুটে এসেছে।

গায়ত্রী মেজদির হাত থেকে গ্রুপ ফটোখানা কেড়ে নিয়ে দেখলে, কি সুন্দর। কি সুন্দর।

গীতা বললে, বাবার শালের কাজটা কত স্পষ্ট উঠেছে দেখ্!

গায়ত্রী বললে, দিদির শাড়ির পাড়টাও।

গৌরী কিছুই বললে না।

ওরা দু'জনেই রঞ্জিৎকে ওপারে ডেকে আনলে। মা ওকে চা করে খাওয়ালো।

শ্যামল তখনই ফিরেছে কলেজ থেকে। ছবি দেখে মেয়েলি কান্নার সুরে বললে, আমার চোখ দেখা যাচ্ছে না।

মা ধমক দিলো, তোর চশমার যা কাঁচ, চোখ দেখা যায় নাকি।

অঞ্জলি বললে, আমার গলার হারটা কিন্তু ঠিক উঠেছে।

আরতি বললে, মেজদির ছবিটা এত ভালো হলো কেন!

আর রঞ্জিৎ চলে যেতেই গৌরী বললে, ছাই ছবি! বাবার যেমন কাণ্ড।

মুখে যাই বলুক ওর যে ছবিখানা বাড়ির সকলের অজান্তে তোলা হয়েছিল সেই ছবিখানা দেখার আগ্রহ কম ছিল না। কিন্তু নিজে থেকে গিয়ে চেয়ে আনতে বড় লজ্জা করতো গৌরীর।

মহিমবাবুদের বাড়িটা ওর কলেজের রাস্তাতেই পড়তো, বারকয়েক নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে মা'র সঙ্গে গিয়েছেও সে-বাড়িতে, তবু ছবির জন্যে রঞ্জিতের কাছে যাওয়ায় ভীষণ অস্বস্তি। মহিমবাবু যদি থাকেন, কিংবা রঞ্জিতের মা। থাকবেনই তো তিনি। কি বলবে তখন গৌরী।

কিসের ছবি, কখন তুললো। কিংবা বাবার কাছে হয়তো কোনদিন গল্প করে বসবে।

ইচ্ছে থাকলেই তো সুযোগ হয় না। আর ছেলেটাও কি

ফাজিল, কি দুঃসাহস। লুকিয়ে লুকিয়ে ছবি তোলার কি দরকার বাপু!

সুযোগ কিন্তু জুটে গেল একদিন।

দিদি এসে বললে, আমার এক কপি ছবি চাই। বাবাকে বলো না, মা।

মা বললেন, তোর বাবার কি আজকাল সময় আছে। আপিস থেকে ফিরেই তো ট্যুইশনিতে বেরিয়ে যায়।

সত্যি, টাকার টানাটানিতে সেই মাসেই বাবা একটা ট্যুইশনি নিয়েছে।

দিদি বললে, শ্যামল একদিন গিয়ে নিয়ে আয় না ভাই। টাকা যা লাগে আমি দেবো।

শ্যামল ঠোঁট উল্টে বললে, ভারী তো ছবি! ও আর-এক কপি চাইতেও লজ্জা হয়।

শ্যামল কিছুতেই রাজি হলো না। শেষে বললে, কেন মেজদিকে বলো না, ও কলেজ থেকে ফেরবার সময়···

গৌরী বলে উঠলো, বেশ বেশ তাই এনে দেবো, ভারী তো কাজ, তার জন্যে তোমায় অত খোশামোদ করবে না কেউ।

গৌরীও কি সুযোগটা হাতছাড়া করতে চায় নি? অভিনয় করেছিল রাগ দেখিয়ে? না, ও নিজেই বোঝে না কেন কথাটা ওর মুখ দিয়ে বেরিয়েছিল। ভিতরে ভিতরে গোপন করে রাখা সুপ্ত ইচ্ছাটা হঠাৎ ওইভাবে প্রকাশ হয়ে পাড়ছিল কিনা গৌরী বলতে পারে না।

তাই, মা যখন বললে পারবি? তখন অস্বস্তি বোধ করলে।

আরও অস্বস্তি রঞ্জিতের কাছে যেতে।

পর পর দু'দিন যাই যাই করেও পারলে না। প্রত্যেকদিনই বলে, ভুলে গিয়েছিলাম।

শেষে একদিন সাহসে ভর করে চলে গেল।

চলে গেল বলা যায় না। বরং না যেতে হলেই যেন বেঁচে যায়। শুধু মহিমবাবুদের বাড়ির কাছটুকু পার হওয়ার সময় একটু আস্তে আস্তে হাঁটলো, যদি হঠাৎ রঞ্জিৎ ওকে দেখতে পায় এই ভরসায়।

কিন্তু বাড়ির দরজা বন্ধ। আর ও গিয়ে দরজার কড়া নাড়বে কিনা ভাবতে ভাবতেই বাড়িটা পার হয়ে গেল।

তারপর মনে সাহস এনে হঠাৎ ফিরে দাঁড়ালো, ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলে, ফিরে এলো।

দরজার পাশে একটা কলিং বেল দেখতে পেয়ে সবে হাত বাড়াতে যাবে, অমনি পাশের জানালাটায় চোখ গেল। আর চোখোচোখি হলো রঞ্জিতের সঙ্গে।

রঞ্জিৎ যেন একরকম ছুটে এসে দরজা খুলে দিলো।

বললে, আসুন, আসুন।

নিয়ে গিয়ে ওর স্টুডিও ঘরে বসালো।

চারপাশের দেওয়ালে কয়েকখানা বড় বড় ছবি টাঙানো। কোনোটা কোনারকের মন্দিরের, কোনোটা গঙ্গার বুকে জাহাজ, একটা অশীতিপর বৃদ্ধার জরাজীর্ণ রেখাসম্বল মুখ।

রঞ্জিৎ একখানা মোড়া টেনে দিয়ে বললে, ছবিটা তেমন ভালো হয় নি। বলে হাসলে।

দেরাজের ভিতর থেকে ফোটোগ্রাফখানা এনে দেখালে।

খুশীর হাসি ফুটলো গৌরীর চোখেমুখে। বেশ ভালোই তো হয়েছে। ভালো হয় নি বলছে কেন রঞ্জিৎ!

—না, না, তেমন ভালো হয় নি। আপনার ছবি এর চেয়ে অনেক সুন্দর হবার কথা।

কথাটা শুনে কি ঈষৎ লজ্জা পেল গৌরী? না, ইতিমধ্যে ওর মনের জড়তা কেটে গেছে। বেশ সপ্রতিভ হয়ে উঠেছে ও। তাই রঞ্জিৎ যে ঘুরিয়ে বললে ও অনেক বেশী সুন্দর সে-কথাটা শুনতে খারাপ লাগলো না।

গৌরী তাই মুচকি হেসে ছবিখানা উরুর ওপর চেপে রাখলে এক হাতে, তারপর দেওয়ালের ছবিগুলো খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে শুরু করলে।

কোনারকের মন্দিরের ছবিটা বহুবার দেখেছে, তবু ভালো লাগলো। সমুদ্রের বুকে নুলিয়ারা নৌকো নামাবার চেষ্টা করছে, সাদা সাদা ফেনা, পাড়ে এক ভদ্রমহিলা বাচ্চা একটি ছেলের হাত ধরে সে-দৃশ্য দেখছেন। খুব জমকালো পোশাক পরা এক রাজপুত তরুণ—দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। একটার পর একটা ছবি দেখে গৌরী আর বলে, সত্যি, কি সুন্দর ছবি তোলেন আপনি!

বলতে বলতে হঠাৎ ও চোখ নামিয়ে নিলো একখানা ফটোর দিকে চোখ পড়তেই। কোনারকের মিথুনমূর্তি।

গৌরী লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করে টেবিলের ওপরের ছবিগুলোর দিকে চোখ ফেরালো, যেন ওই কান লাল করা ছবিটা ওর চোখে পড়ে নি।

রঞ্জিৎ এবার ধীরে ধীরে বললে, ফিল্মটা যে দোকান থেকে নিয়েছিলাম, বোধহয় ঠকিয়ে পুরোনো দিয়ে দিয়েছিল। তাই······

গৌরী হাসলো। সপ্রতিভভাবেই বললে, ফিল্মটা পুরোনো না ক্যামেরাম্যান নতুন?

রঞ্জিৎ হেসে বললে, নতুন যে নয় সেটুকুর প্রমাণ দিতে না পারলে স্বস্তি পাচ্ছি না।

—অর্থাৎ? কৌতুকে ভুরু কাঁপালো গৌরী।

—অর্থাৎ আজ যখন এসেই পড়েছেন, ভালো ছবি একটা তুলতে চাই।

গৌরীরই কি অনিচ্ছা! যে-ছবিটা ও পেয়েছে সেটাই খুব ভালো লেগেছে, আরো ভালো পেলে খুশী হবে না কেন? নিজেকে সুন্দর দেখার ইচ্ছে কার না হয়। এত সাজগোজ স্নো পাউডার, আয়নার

সামনে দাঁড়িয়ে থাকা—আর ওই নিজেকে ফটোর মধ্যে সুন্দর দেখতে চাওয়া—দুই তো একই বাসনা।

গৌরী তবু হেসে বললে, আজ আবার ক্যামেরাটা পুরোনো নয় তো!

রঞ্জিৎ হাসলো। কোনো উত্তর দিলে না। তারপর চটপট করে কয়েকটা সুইচ টিপলে।

ঘরের মাঝখানে কাঠের পার্টিশন দিয়ে ওধারে স্টুডিও। সেখানে বড় বড় কয়েকটা আলো জ্বলে উঠলো।

পট পট করে সেগুলো নিভিয়ে দিয়ে শুধু একটা আলো জ্বেলে রেখে রঞ্জিৎ ডাকলো।—আসুন, এখানে বসুন।

গৌরীর তখন বেশ মজা লাগছে। রঞ্জিতের চোখে একটা মুগ্ধ ভাব লক্ষ্য করে কৌতুক বোধ করতে শুরু করেছে।

—আসুন।

গৌরী উঠলো। কুশনটায় বসতে বসতে বললে, তার আগে যে একটা কথা ছিল।

—বলুন।

পাঞ্জাবির দু'পকেটে হাত ঢুকিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো রঞ্জিৎ।

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, গ্রুপ ফটোখানার আরেকটা কপি চাই। দিদির জন্যে।

—ও, এই কথা। হেসে ফেললে রঞ্জিৎ। বললে, বেশ তো, করে রাখবো, দিন কয়েক দেরি হবে কিন্তু।

গৌরী সে-কথার জবাব না দিয়ে বললে, দিদি বলেছে, টাকা নিতে হবে।

—নেবো। ছবি তোলা তো পেশা আমার, টাকা যখন সকলের কাছেই নিই, তখন আর……

গৌরী আঁতকে উঠলো যেন। কপট আতঙ্কে হেসে হেসে বললে, ও বাবা, তা হলে আমার ছবি তুলে কাজ নেই।

সত্যিই উঠে দাঁড়িয়ে পড়ছিল ও, রঞ্জিৎ চট্ করে এগিয়ে এসে ওর একখানা হাত ধরে ফেলে বললো, বসুন।

বসতে হলো।

তারপর একটার পর একটা ছবি তুলে চললো রঞ্জিৎ। কখনো মুখটা একটু ঘুরিয়ে দেয়, কখনো বেণীটা বুকের ওপর নামিয়ে দেয়, কখনো হাসতে বলে।

যেন মানুষটাকে নেশায় পেয়েছে। একবার করে বড় বড় আলোগুলো জ্বলে ওঠে, ছবি তোলা হয়, আলো নিভে যায়, পাখা চলতে শুরু করে।

ছবি তুলতে তুলতে হঠাৎ একবার রঞ্জিৎ সামনে এসে শাড়ির আঁচলটা আঁট করে টেনে দিলে বুকের ওপর দিয়ে। আর সেই মুহূর্তে দুটো আঙুলের হাল্কা স্পর্শ শিহরণ দিয়ে গেল গৌরীর শরীরে।

লজ্জা, অস্বস্তি, ঈষৎ রাগ, অন্ধ উত্তেজনা।

কিন্তু রঞ্জিৎ যেন যন্ত্রের মানুষ। কোনো ভাবান্তর নেই তার মুখে, আলো কমিয়ে বাড়িয়ে গৌরীর মুখখানাকে ও তখন ক্যামেরার ভিতর দিয়ে অণুবীক্ষণ দৃষ্টিতে দেখতে ব্যস্ত, প্যাথোলজিস্ট যেমন করে জীবাণু দেখে, জীবাণুর চরিত্র আবিষ্কার করতে চেষ্টা করে।

অস্বস্তিটা তার মুহূর্তেই কেটে গেল।

—আসুন।

হাঁপ ছেড়ে বাঁচলো গৌরী। বেরিয়ে এসে জানালার ধারে দাঁড়ালো।

রঞ্জিৎ বললে, বাঃ রে, বসুন একটু। চা খবেন না?

—না।

—এক মিনিট, এই তো স্টোভ রয়েছে···

গৌরী হেসে বললে, অনেক দেরি হয়ে গেছে।

রঞ্জিৎ হেসে বললে, তা হলে কবে আসছেন আবার?

—কবে আসবো, বলুন।

—পরশু দিন। এই সময়েই কলেজ ফেরার পথে একবার···

গৌরী হেসে বললে, গ্রুপ ফটোটা এত তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে?

রঞ্জিৎ হেসে ঘাড় নেড়ে সায় জানালো।

আর গৌরী সেই রৌদ্রমাখা দুপুরের পথে চলতে চলতে মনের মধ্যে একটা ফূর্তির গুনগুনুনিতে ভাসতে ভাসতে বাড়ি ফিরলো।

আশ্চর্য। সেদিনটার কথা মনের মধ্যে উঁকি দিলেই সমস্ত শরীর এমন বিষিয়ে উঠছে কেন!

বারান্দার আবছা অন্ধকারে বসে শুকিয়ে যাওয়া ফুল গাছের শূন্য টবের ওপর গোড়ালি রেখে দূরের নিভে যাওয়া আলোর নিচের ওই জমাট অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে এমন নিঃস্ব মনে হয় কেন গৌরীর।

সব তো চুকেবুকে গেছে। সব, সব।

কিন্তু, এখানে, জীবনের যে আশ্রয়কে চিরদিনের আশ্রয় বলে মনে হয়েছিল, সেখানেও সেই আগ্রহ আনন্দ নেই কেন!

প্রথম যখন স্যুটকেসটা হাতে নিয়ে নামলো গৌরী রিকশা থেকে, মনে হয়েছিল, সব আছে, সব ফিরে পাবে। না, কিছুই নেই, সব হারিয়েছে গৌরী। তা না হলে বাবা ভালোভাবে আরো দুটো কথা বললো না কেন, শ্যামল না হয় পড়ছে, কিন্তু গীতা গায়ত্রী অঞ্জলি আরতি সবাই একে একে সরে গেল কেন!

মা! মাও কি তবে গৌরীকে এড়িয়ে যেতে চান!

অশোকা দেবী ভেবেছিলেন, দু'দিন পরেই ব্যাপারটা থিতিয়ে যাবে। গৌরীকে নিয়ে নতুন কোনো সমস্যার উদ্ভব হবে না।

কিন্তু গৌরী যেন কিছুতেই আর সকলের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে না। এখানে আসার আগে সে এক রকম ছিল, এখানে এসে বুঝি বা বদলে গেল।

প্রথম প্রথম যেটুকু হাসি-আনন্দ-উল্লাসে মেতে থাকতো ভাই-বোনদের সঙ্গে, ক'টা দিন যেতে না যেতেই তা উবে গেল গৌরীর মন থেকে।

আসলে গৌরী বুঝতে পারছিল তার পায়ের তলার মাটি সরে গেছে। কিংবা ওটা ওর মনের ভুল। ও কি করে ভাবলো, গীতা গায়ত্রীরা বা বাবা মা শ্যামল সর্বক্ষণ ওর কাছে কাছে থাকবে, ওর উপস্থিতিতে আনন্দ দেখাবে।

এর আগেও যখন এসেছে ও এ-বাড়িতে, কিংবা সেই বিয়ের আগের দিনগুলিতে ভাইবোনদের কাছে যে ব্যবহার পেয়েছে, তার সঙ্গে আজকের ব্যবহারের হয়তো কোনো পার্থক্যই নেই। তবু, তখন ও তো ভালোবাসার কাঙাল ছিল না, তাই যা-কিছু দেখেছে, যা-কিছু ঘটেছে সবই মনে হয়েছে স্বাভাবিক।

আর আজ?

অশোকা দেবী ভেবেছিলেন, জামাইয়ের সঙ্গে কোনো কারণে মনোমালিন্য রাগারাগি হয়েছে মেয়ের। দু'দিনেই রাগ পড়ে যাবে।

সে-কথা ভেবেছিলেন বলেই গৌরীর সিঁদুর মুছে ফেলা সিঁথির দিকে তাকিয়ে আতঙ্ক বোধ করেছিলেন। এ কি অলক্ষুণে কাণ্ড। স্বামীর সঙ্গে মতের অমিল, ঝগড়াঝাটি কার না হয়। অভিমান করে বাপের বাড়িতে চলেও আসে। তা বলে সিঁথির সিঁদুর কে কবে মুছে ফেলে!

গৌরীর কথা ভেবেই সেদিন সত্যনারায়ণ পুজোর ব্যবস্থা করেছিলেন। পুজোআর্চার তেমন নেশা নেই অশোকা দেবীর। লক্ষ্মীবারে কোনোরকমে নমো নমো করে পুজো সারেন। কিন্তু বিপদে-আপদে ঠাকুরের শরণ না নিয়ে উপায় কি।

সত্যনারায়ণ পাঠ হয়ে যাওয়ার পর ছেলেমেয়েদের সঙ্গে গৌরীকে ডেকে পাঠালেন। শান্তিজল নেবার জন্যে।

গৌরী প্রথমটা আসতে চায় নি।

অশোকা দেবী তখন নিজেই ডাক দিলেন।—ত্মাথ গৌরী, অত বাড়াবাড়ি করিস না। আয় এদিকে।

গৌরী কি আর করবে। এসে মুখ বুজে বসলো।

তারপর শান্তিজল ছিটিয়ে পুরুতমশাই চলে যেতেই শাল পাতায় মোছা সিঁদুর নিয়ে গৌরীর সিঁথিতে দিতে গেলেন।

গৌরী আপত্তি করে সরে এলো।

মা ধমক দিলো। গৌরীর সিঁথিতে সিঁদুর দিয়ে দিলে, তারপর হাতের নোয়ায় ঠেকাতে গিয়ে লক্ষ্য করলে, নোয়া নেই।

বড় মেয়েও তো নোয়া পরে না। আজকালকার মেয়েদের কাছে ওটা বালাই। ফেলে দিতে পারলেই বাঁচে।

তাই অশোকা দেবী কিছু বললেন না। শুধু সিঁদুর মাখা আঙুলটা গৌরীর চুড়িতে ঠেকিয়ে অন্য ছেলেমেয়েদের প্রসাদ দিতে গেলেন।

আর গৌরী ধীরে ধীরে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

ভিজে গামছাটা ঘষে ঘষে সিঁদুর মুছে ফেললো। ছিন্নবিচ্ছিন্ন একটি হৃদয়ের রক্তাক্ত চিহ্নটুকু যেন মুছে দিতে পারলেই বাঁচে। কিন্তু সিঁথির সিঁদুর মুছে দিলেই কি স্মৃতির সিঁদুর মুছে দেওয়া যায়?

খানিক পরেই লক্ষ্য পড়লো অশোকা দেবীর। মনে মনে রুষ্ট হলেন। কিন্তু মুখ ফুটে কিছু বললেন না।

গীতা গায়ত্রী শ্যামল সকলেই লক্ষ্য করলো একে একে। বাবা-মা'র মাঝরাতের ফিসফিসানি কানে গেল। বুঝলো একটা অঘটন কিছু ঘটে গেছে মেজদির জীবনে। দুঃখ পেল। কিন্তু কিই বা করতে পারে ওরা।

রোগা-চেহারার শ্যামল খবরটা জানতে পেরেই আরো একটু কাছে এগিয়ে আসতে চাইলো।

—মেজদি, চুপচাপ তুমি এমন দিনরাত বসে থাকো কেন বলো তো? আমার শার্টের পকেটটা সেলাই করে দিলে তো পারো।

পুরু চশমার ভেতর থেকে ওর তীক্ষ্ণ অথচ ক্লান্ত চোখজোড়া দুষ্টুমির হাসি হাসে।

শ্যামলের কথা শুনে গৌরীও হেসে ফেলে।

বলে, বসে বসে মেজদি দু'বেলা তোদের অন্ন ধ্বংস করছে বলে বুঝি কাজ করিয়ে নিতে চাস ?

—কি যে বলো, পকেটটা ছিঁড়ে গেলে সেটুকু সেলাই করে দেওয়াও কি কাজ নাকি ? নেহাত ছুঁচে সূতো পরাতে পারি নে তাই।

—কেন, সেলাইয়ের কল কি হলো ?

শ্যামল হাসে।—গীতা যে তার দফা সেরে দিয়েছে আবার। বাবা বলেছেন, আর টাকা খরচ করে সারাতে পারবেন না।

গৌরী উঠে দাঁড়ায়। বলে, বেশ, দে তোর কি করতে হবে। হেসে বলে, এখন তো তবু বাবা-মা রয়েছে, তোর বাড়িতে একবেলা খেতে চাইলে না জানি আরো কি করিয়ে নিবি।

শ্যামলের হাতেই ছিল শার্টটা, পরতে গিয়ে পকেটের সেলাই খুলে গেছে দেখেই বলেছিল ও। সেটা এবার ছুঁড়ে দিল মেজদির দিকে, দিয়ে বললে, ছ্যাখো মেজদি, তুমি বড়দির মতো কথা বলো না, মানায় না তোমার মুখে।

গৌরী হাসলো।—মানায় না ? স্নিগ্ধ স্নেহের দৃষ্টিতে শ্যামলের শীর্ণ মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলো। চোখে হাসি এনে বললে, সত্যি কথার আবার মানানো অমানানো আছে নাকি ?

—আছে। আমার চেয়ে ক'টা বছরের তো বড় তুমি, অথচ বুড়িদের মতো কথা বলছো যেন।

ওদের ঝগড়া শুনে অঞ্জলি আর আরতিও এসে দাঁড়িয়েছিল। তারাও হেসে লুটিয়ে পড়ে আর কি !

—দাদা তো ঠিকই বলেছে। অঞ্জলি বললে।

আর শ্যামল বললে, বিয়ে হলেই মেয়েরা ভাবে গুরুজন হয়ে গেছি, কেবল শাসন করতে চায় !

গৌরীও এতক্ষণ হাসছিল ওদের কথায়। কিন্তু যেন সে-কথা শুনেই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে গেল।

মনে হয়েছিল পায়ের কাঁটাটা বের হয়ে গেছে, কিন্তু অসতর্ক ভাবেই তো পা ফেলতে গিয়েই সেটা যেন আবার খচ্ করে লেগেছে।

তাই মুখ বুজে ছুঁচ আর সুতো চেয়ে নিয়ে মাথা হেঁট করে শ্যামলের ছেঁড়া পকেটটা সেলাই করতে শুরু করলো গৌরী।

আর উঁচু-কপাল পুরু লেন্সের চশমায় ম্লান মনে হওয়া শ্যামলের শীর্ণ মুখখানা আরো ম্লান হয়ে গেল।

সারা বাড়িতে একজনই শুধু আপন মানুষ, অন্তরঙ্গ মানুষ। বাবা।

এমনিতে গৌরী কখনও বাবাকে বেশী কথার মানুষ বলে ভাবতে পারে নি। নেহাত জরুরী দু'চারটে সাংসারিক কথাবার্তা, দু'একটা হতাশার দীর্ঘশ্বাস। মাঝে মাঝে শুধু শ্যামলের পড়াশুনোর খোঁজ নিতেন, যেটুকু বুঝতেন বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করতেন, তারপর বোকা বোকা হেসে বলতেন, তোমাদের অতসব বইপত্র কি আমি পড়েছি—

নিজের অজ্ঞতা প্রকাশ করার কোনো কুণ্ঠা ছিল না, বরং কখনও কখনও তা বাড়িয়ে বলেছেন। তবু শ্যামলের ওপর বাবার স্নেহ যেন একটু বেশীই ছিল।

তাই বোনেরা অনুযোগ করতো।—বাবা শুধু দাদাকেই ভালোবাসে, আমরা মায়েরও চক্ষুশূল, বাবারও।

বাবা শুনে হাসতেন। কিন্তু ভান করেও তাদের কাছে ডেকে স্নেহের ভাগ দিতে চাইতেন না।

মা ঠাট্টা করে বলতেন, ছেলে হলো মূলধন, তোরা তো পাওনাদার।

বোনেরা সবাই হেসে লুটোপুটি খেত।

।বার এই শান্ত গম্ভীর চেহারাটাই দেখে এসেছিল পুরু চশ

দুষ্টুমির হর্ষ সেই মানুষই কি করে যেন দিনে দিনে বদলে গেল। বিশেষ রে গৌরী কাছে এলেই।

কোনো কাজ নেই। বিষণ্ণ সকাল, বিষণ্ণ বিকেল। চুপ করে বসে থাকলেই যত অনুতাপ আর দুশ্চিন্তা মনের ওপর বিছুটি বিছোয়। তাই সংসারের কাজে নিজেকে ডুবিয়ে দিতে চেষ্টা করলো গৌরী।

বাবার জুতোয় কালি পড়ে নি অনেকদিন। গৌরী নিজেই একদিন জুতোজোড়া টেনে নিয়ে কালি লাগিয়ে ব্রাশ করতে বসলো।

বাবা দেখলেন দূর থেকে। হাসি হাসি মুখে গৌরীর দিকে ফিরে তাকিয়ে বললেন, ছাখ গৌরী, তোর তবু চোখ পড়েছে বাপের দিকে। ওরা শুধু নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত।

গেঞ্জীতে সাবান দিতে গেলেও ওই এক কথা। প্রথম প্রথম শুনে লজ্জা পেত গৌরী।

এক এক সময় নিজের ওপরই সন্দেহ হতো। পায়ের নিচে মাটি সরে গেছে বলেই কি বাপ-মা'র মন যুগিয়ে চলার চেষ্টা করছে ও? না কি নিজেকে কাজের মধ্যে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করছে?

বাবার প্রশংসায় অস্বস্তি বোধ করতো গৌরী, কিন্তু ভালোও লাগতো। একজন অন্তত ওকে আপন মনে করছে।

সকালে উঠেই চা খেতে খেতে খবরের কাগজটা টেনে নিয়ে গৌরীকে ডাক দেন।

—দেখেছিস গৌরী, কি সাংঘাতিক ঝড় হয়ে গেছে কুচবিহারে।

গৌরী হাসি হাসি মুখে এগিয়ে এসে বসে।—ইস্, লোকগুলোর দুর্দশা দেখো। একটা ছবির দিকে চোখ রেখে গৌরী আশ্রয়-হারানো লোকগুলোর ছবি দেখে।

ও নিজেও যে আশ্রয় হারিয়েছে, মুহূর্তের জন্যে যেন সে-কথা ভুলে যায়।

দুর্দশার কি আর শেষ আছে মা। সারা দেশটাই তো দুর্দশার কবলে। এই যে চালের দাম···

একটার পর একটা খবরের ওপর চোখ বুলিয়ে গৌরীর সঙ্গে আলোচনা না করে যেন ভালোই লাগে না।

গৌরী হেসে বলে, খবর মানেই তো কেবল দুঃখের, দুর্দশার খবর, ও না পড়াই ভালো।

বাবা হাসেন। তারপর মাকে সামনে এসে দাঁড়াতে দেখে মুখ তুলে তাকান। নিজের মনেই বলেন, তা যা বলেছিস।

মা গম্ভীর হয়ে বলে, তবে আর ওটা পড়া কেন, ছেড়ে দিলে তবু তো কিছুটা সাশ্রয় হয়।

শ্যামলও ইতিমধ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। কাগজের ওপর একবার চোখ বুলিয়ে না নিলে শান্তি নেই যেন!

সে বলে বসে, কি যে বলো মা, খবরের কাগজ পড়বো না, আর বিংশ শতাব্দীতে বাস করবো!

গৌরী ধমক দেয়।—চুপ কর, ভারী আধুনিক হয়েছেন উনি।

মা বলে, তা নয় বুঝলাম, কিন্তু সব জিনিসের দাম বাড়ছে ওরা যে লেখে, কই নিজেদের কাগজটার দাম তো কমায় না।

শ্যামল কি একটা যুক্তি দিয়ে বোঝাতে চায়, তার আগে অশোকা দেবী সরে গেছেন। ডাল পুড়ে যাচ্ছে বোধহয়।

রাত্রেও ট্যুইশনি সেরে এসে খেতে বসে গৌরীর সঙ্গে গল্প জুড়ে দেন বাবা।

গৌরী বোঝে তার অসহায় অবস্থাটা চাপা দেবার জন্যেই এত কথা বলতে শুরু করেছেন উনি। এক এক সময় ভালো লাগে, এক এক সময় অস্বস্তি

তবু বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো।

হঠাৎ একদিন বাবা ফিরে এসে বললেন, হ্যাঁ রে, গৌরী, চুপচাপ সারাটা দিন বসে থাকিস, একটা চাকরি করবি?

চাকরি!

গৌরী চমকে উঠলো।

রঞ্জিতের সঙ্গে বিয়ে হওয়ার আগে একবার চাকরির জন্যে দরখাস্ত করেছিল একটা। ইণ্টারভিউয়ে ডাকও এসেছিল। অথচ তখন কিছুতেই মত দেন নি বাবা। মা-ও আপত্তি করেছিলেন।

—ওসব তোর মাথায় কে ঢোকালো? ভদ্রঘরের মেয়েরা আবার চাকরি করে নাকি?

গৌরী অনেক বোঝাতে চেষ্টা করেছিল।—অনেকেই তো করে। ওরা বুঝি ভদ্রঘরের নয়?

মা বলেছিলেন, নেহাত দায়ে পড়ে করতে হয় বৈকি অনেককে, তা বলে তুই—

শ্যামল সেদিন মেজদির পক্ষ নিয়েছিল।—কত বড় বড় লোকের বাড়ির মেয়েরা চাকরি করে।

গৌরী বলেছে, চাকরি করাটা যদি খারাপই হবে তো পুরুষরা করে কেন?

বাবা মা সেদিন কোনো যুক্তিতেই কান দেন নি। বলেছেন, না, না, এ-বাড়ির মেয়েরা চাকরি করবে ভাবতেও লজ্জা। পাড়াপড়শি ভাববে কি!

আশ্চর্য, সেদিন যে ব্যাপারটায় এত আপত্তি ছিল এই দুটো বছরেই কিনা সে পাঁচিলটা সরে গেল।

গৌরী তাই বাবার কথায় চমকে উঠলো।

কোনো উত্তর দিতে পারলো না।

বাবা বললেন, ভেবে দেখ। তুই তো মা লেখাপড়া জানা মেয়ে, পারবি তুই। বৃন্দাবনবাবু বলছিলেন, চেষ্টা করে চাকরি একটা…

গৌরী চুপ করে রইলো। বাবা আপিস চলে যাওয়ার পরও ওর মনের মধ্যে কথাটা ঘুরে বেড়ালো।

ইতিমধ্যে আপিসে আপিসে এত মেয়ে চাকরি করছে বলেই কি সব আপত্তি উঠে গেছে? হয়তো তাই। এ-গলির থেকেই তো দু'তিনটি মেয়ে রোজ সকালে আপিস যায়। একজন গৌরীরই ছোটবেলাকার বন্ধু।

সত্যি, এক অদ্ভুত মজা। ভালো-মন্দ বলে কোনো কিছুরই বিচার নেই। একজন কেউ কিছু করতে চাইলেই তা খারাপ, কিন্তু দু'দিন পরে দলে দলে সবাই যদি সেই পথে যেতে শুরু করে তখন আর মন্দ নয়। সব দোষ শুধু সংখ্যাগুণেই কেটে যায়। নিজের মনেই হাসলো গৌরী।

প্রয়োজনে পড়ে, অর্থাভাবে চাকরি করতে গেলে তখন আর কোনো বাধাই বাধা নয়। অথচ গৌরী যখন চাকরি করতে চেয়েছিল, তখন? তখন যে আপিসে মেয়েদের সংখ্যা অনেক কম ছিল।

হঠাৎ একটা প্রশ্ন উঁকি দিলো গৌরীর মনে।

বাবা হঠাৎ আজ চাকরির কথা বলছেন কেন? অর্থাভাবে সংসারটা সরলভাবে চলছে না বলেই হয়তো। হয়তো বাবা চান, গৌরীও কিছু রোজগার করুক। তার দায়-দায়িত্ব অন্তত নিজেই বইতে পারুক। তাই কি?

মা কি বাবাকে কিছু বলেছে! অভাব অনটন ছাড়া তো মা'র মুখে কোনো কথা নেই। দু'দণ্ড শান্তিতে থাকতে দেয় না বাবাকে।

মা হয়তো বলেছে, এই অভাবের সংসারে ওর ভার আবার নেব কি করে!

বাবা সেটাকেই ঘুরিয়ে বলেছেন। তা না হলে, কই ও যে সারাদিন চুপচাপ একা একা থাকে, এ-কথা তো বাবার জানবার কথা নয়।

একটা চাকরি করতে পেলে গৌরী নিশ্চয়ই খুশী হয়। তবু

সময় কাটে। কিন্তু বাবা এ-ভাবে কথাটা বলার ফলেই ওর মনটা কেমন বিস্বাদ হয়ে রইলো।

আর এত তাড়াহুড়োরই বা কি আছে। মাত্র দুটো মাস ও এখানে এসেছে। এই দুটো মাসেই কি অসহ্য মনে হচ্ছে?

একদিন হয়তো ও নিজেই বলতো। সংসারের অবস্থা ও তো দেখছে। একদিন নিজেই বলতো, একটা চাকরি-বাকরি কিছু করি, মা, তুমি অমত কোরো না।

সে কথাটা গৌরীকে বলতে দিলো না কেন এরা!

সংসারের অবস্থা, বাড়ির অবস্থা কি গৌরীর চোখে পড়ে নি! না কি নিজের দায়-দায়িত্ব বুঝতে পারার মতো বুদ্ধি ওর নেই!

অভাব তো ও নিজেও দেখতে পাচ্ছে। অভাব কিছুটা দূর করতে পারলে ও কি অকর্মণ্য হয়ে বসে থাকতে চাইতো?

তাই মনের মধ্যে রাগ চেপে রেখেই ও বলে বসলো, চাকরিই করবো ভাবছি।

শুধু বলতে গিয়ে মা'র দিকে ফিরে তাকিয়ে ধীরে ধীরে বললে, তোমাদের যদি অসম্মান না হয়।

খবর শুনে দিদি আর জামাইবাবুও একদিন এসে হাজির হলো। খবরটা হয়তো অশোকা দেবীই পাঠিয়েছিলেন বড় মেয়ের কাছে।

বছর পাঁচেক আগে বিয়ে হয়েছে গঙ্গার, কোলের ছেলেটারও ইতিমধ্যে তিন বছর বয়েস হয়েছে। দিদিকে দেখে যত না খুশী হলো গৌরী, তার চেয়ে বেশী হলো ফুটফুটে গোলগাল বাচ্চা ছেলেটাকে দেখে।

হাসতে হাসতে ছুটে এসে বাচ্চাটাকে কোলে তুলে নিলো গৌরী, আদরে আদরে তার মুখে চুমো খেয়ে বিরক্ত করে তুললো ছেলেটাকে।

বাপ্পু কেঁদে উঠলো, আর সে যত কাঁদে গৌরী তত বিরক্ত করে তাকে। শেষে মা এসে তাকে ছিনিয়ে নিলো গৌরীর হাত থেকে।

বললে, ও এলেই তোরা সবাই কাড়াকাড়ি করে নিয়ে যাস, নাতিকে আমি আর আদর করতে পাই না।

ছোট মেয়ে আরতি ফ্রক পরে, জামাইবাবুকে তার লজ্জা নেই। সেও হেসে বলে উঠলো, মা, তুমিও কিনা ঠাকুমা হয়ে গেছ, সত্যি ভাবতে কেমন লাগে। বলে হেসে উঠলো।

অশোকা দেবীও একটু লজ্জা পেলেন। সত্যি, ছেলে-মেয়ে তাঁর অনেক, তবু বয়সে এবং চেহারায় তাঁকে এখনও ঠাকুমা হিসেবে মানায় না। তাঁর নিজেরই লজ্জা।

সেটুকু চাপা দেবার জন্যেই বাপ্পুকে কোলে নিয়ে জামাইয়ের সামনে থেকে সরে গেলেন।

আর তখন গৌরী মৃদু হেসে জিগ্যেস করলো, জামাইবাবু, ভালো আছেন?

জামাইবাবু ঘাড় নাড়লো। কিন্তু প্রতিপ্রশ্ন করলো না, জানতে চাইলো না গৌরী ভালো আছে কিনা। অর্থাৎ দিদি-জামাইবাবুও শুনেছে, টের পেয়েছে।

গঙ্গা—গৌরীর দিদি—গীতাকে কাছে পেয়ে বললে, এই, তোরা কি হয়েছিস বলতো, একটা কাপড় দে, এই পরেই গরমে ঘামবো নাকি?

গায়ত্রী ছুটে গেল।—আনছি।

—আনতে হবে না, চল আমিই যাচ্ছি।

গঙ্গা তার পিছনে পিছনে চলে গেল। আর গীতা সেদিকে তাকিয়ে হাসলো।

গঙ্গা ফিরে তাকাতেই বললে, জামাইবাবুর জন্যে কি কি চাই বলে গেলে না বড়দি?

গঙ্গা চোখ পাকালো।—ইয়ার্কি হচ্ছে?

শ্যামল আর গৌরী তা দেখে হেসে উঠলো।

দিদিকে নিয়ে এজন্যে গৌরীও কম হাসি ঠাট্টা করে নি আগে। বলেছে, পাঁচ পাঁচটা শালী জামাইবাবুর, তবু তোমার এত দুর্ভাবনা কেন বলো তো! আমরা কি তাকে খেতে দিই না, না বসতে বলি না।

আসলে দুর্ভাবনা নয়, গঙ্গার ওটাই স্বভাব। চিরকাল ধরেই সকলে দেখে আসছে। নিজের সুখসুবিধে নিয়ে দিনরাত তার অভিযোগ, জামাইবাবু কি করে না, শাশুড়ি কি বলে, ননদরা কেমন ইত্যাদি। কিন্তু কাজের বেলায় সব সময়েই জামাইবাবুর পান থেকে যেন চুন না খসে সে-দিকে দৃষ্টি।

দেখে দেখে হাসে ওরা ক'বোন, ইদানীং একটু খোঁটাও দেয় বড়দিকে।

বড়দি চলে যেতেই আরতি কাছে এগিয়ে এলো, বললে, এবার কিন্তু ফাঁকি দিয়ে পালানো হবে না মশাই, মানিব্যাগটা কই দেখি।

গৌরী হেসে বললে, মানিব্যাগ কি হবে রে!

—জামিন চাই না?

জামাইবাবু আরতিকে কাছে টেনে নিয়ে বললে, আমিই তো জামিন রয়েছি।

—উঁহু, কখন কেটে পড়বেন তার ঠিক কি। এবার আর সিনেমা না দেখালে ছাড়ছি না।

অঞ্জু হেসে উঠলো।—এই রে, জামাইবাবু তা হলে ফতুর হয়ে যাবে। এতগুলো শালী, রিকশা ভাড়াই দিতে পারবে না। চারটে রিকশা লাগবে কমসে কম।

সকলেই হোহো করে হেসে উঠলো অঞ্জুর কথায়।

গায়ত্রী হেসে বললে, তিনটে হলেই হবে, আরু আমাদের কোলে বসে যাবে!

আরতি সঙ্গে সঙ্গে বেণী ঝাঁকিয়ে রাগ দেখালো।

—ওরে আমার চালতা, মুখে মাখবে আলতা। আমি সিনেমা

দেখা আদায় করবো আর—কেন, তুমি বরং রিকশার নিচে বসবে।

গৌরী কাজিল মেয়েটাকে ধমক দিতে যাচ্ছিল, তার আগেই মা আর বড়দি এসে হাজির।

মা বললে, কি ছেলে বাপু, দুধ খেতে চাইছে না।

গঙ্গা হেসে বললে, বাটি থেকে চুমুক দিয়ে খাবে? তা হলেই হয়েছে। বোতল ছাড়া ও দুধই খাবে না।

বলে প্লাস্টিকের ব্যাগ থেকে তোয়ালে আর দুধের বোতল বের করে দিলো।

মা বোতলটা ধুয়ে তাতে দুধটা ঢেলে বাপ্পুর মুখে ধরিয়ে দিতেই সে পরম তৃপ্তিতে খেতে শুরু করলো।

আর তা দেখে আরতি গম্ভীর হবার ভান করে বললে, ছেলে তো নয়, সাক্ষাৎ দেবদাস, বোতল ছাড়া চলে না।

এবার মাও হেসে উঠলো, জামাইয়ের সামনেই।

আর গঙ্গা হাসতে হাসতে ছেলেকে মা'র কোল থেকে নিয়ে গীতা গায়ত্রীদের উদ্দেশ্য করে বললে, হ্যাঁ রে, এক কাপ চাও দিবি না নাকি তোদের জামাইবাবুকে!

বলার শুধু অপেক্ষা। এতক্ষণ ওরা যেন এই মুহূর্তটির প্রতীক্ষায় ছিল। বড়দির কথা শোনা মাত্র গীতা আর গায়ত্রী চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে হেসে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অঞ্জু আর আরতিও।

অর্থাৎ জামাইবাবুর কখন কি চাই তা যেন ওরা জানে না। সর্বক্ষণ বড়দি সব মনে পড়িয়ে দিতে চায়। কেবল ভয় তার, জামাইবাবুর যথেষ্ট আদর-আপ্যায়ন হচ্ছে না। তা অবশ্য নয়, বড়দির ওটা স্বভাব।

অশোকা দেবীও জানেন মেয়েরা গঙ্গাকে নিয়ে এ-ব্যাপারে হাসিঠাট্টা করে। তাই সরে গেলেন সেখান থেকে।

আর শ্যামল সরু গলায় ধমকের ভঙ্গিতে বললে, এমন ফাজিল হয়েছিস তোরা !

অঞ্জু জবাব দিলে, তুমি এখানে কেন, যাও না বইয়ের ওপর মাথা ঠুকে বসে থাকবে।

শ্যামল সত্যিই চলে গেল, এ-সব অভব্য কথার মাঝে থাকতেও অস্বস্তি। হাজার হোক বড়দি, গুরুজন—তার সঙ্গে এত ইয়ার্কি ঠাট্টা করে কি করে !

শ্যামল চলে যেতেই তার পিছনে বিদায় করার ভঙ্গিতে হাত নাড়লে আরতি, আর তা দেখে ঠোঁট টিপে হাসলো গৌরী।

ওর মন থেকেও সব ভার নেমে গেছে, গুমোট ভাবটা সরে গেছে। ঠিক যেন সেই আগের দিনের হাল্কা জীবনে ফিরে এসেছে ও।

হিমানীশ বললে, গৌরী এত দূরে দূরে রয়েছো কেন চুপচাপ ? এখানে এসো।

গৌরী মৃদু হাসলে।—দেখছি কতক্ষণ জামাইবাবু সেজে থাকেন। এই গরমে জামাটাও খুলতে চাইছেন না।

গীতা হেসে উঠলো।—ও-বাবা, মনে নেই ? সেই বিয়ের সময়, বাসরে এসেও কপালের চন্দন মুছে যাবে বলে জামাইবাবু কেমন আস্তে আস্তে রুমাল দিয়ে মুখ মুছছিল !

গঙ্গা ধমক দিলো।—বাজে কথা বলিস না, তুই তো তখন ইজের পরতিস।

গীতার কথায় হিমানীশ যত না লজ্জা পেল, বড়দির কথায় আরো বেশী লজ্জা পেল গীতা। নাক উঁচু করে রাগ দেখিয়ে পালাতে যাচ্ছিল, হিমানীশ ওর আঁচলটা খপ করে ধরে কাছে টেনে আনলে।

তারপর পাঞ্জাবিটা খুলে গীতার হাতে দিয়ে বললে; আলনায় রেখে দিয়ে এসো।

গীতা পাঞ্জাবিটা নাকের কাছে নিয়ে গিয়েই মুখ বেঁকালো, যেন ঘামের দুর্গন্ধ আছে।

আর সঙ্গে সঙ্গে হিমানীশ বললে, পদ্মের গন্ধ বুঝি! তাই ভালো লাগছে না?

গৌরী এতক্ষণে সপ্রতিভ হয়েছে, সকলের সঙ্গে মিশে গেছে। সেও মৃদু হেসে বললে, পদ্মের গন্ধ তো হবারই কথা, কি বল গীতা? দিদি তো পদ্মের মতোই সুন্দর, পাশে পাশে থাকলে জামায় একটু পদ্ম পদ্ম···

সকলেই হেসে উঠলো আবার।

মা ততক্ষণে একটা প্লেটে করে গোটা কয়েক সন্দেশ এনে দাঁড়িয়েছে।

আরতি ছুটে গিয়ে টিপয়টা এনে রাখলে সামনে। গায়ত্রী গেল চা করে আনতে।

অঞ্জু জলের গ্লাস এনে নামিয়ে রাখলো।

জামাইবাবুর খাওয়া হতে হতে আরতি নিজেই পান সেজে এনে দিতো। আর কেউ পান না খেলেও বাবা আর মা তো খায়, ব্যবস্থাও আছে। তাই ও পান সাজতে যাবে যাবে ভাবছিল।

কিন্তু তার আগেই বড়দি বলে উঠলো, হ্যাঁ রে, বাড়িতে পান আছে তো!

—থামো, থামো। হাত নেড়ে জবাব দিলো গীতা, বললে, জামাইবাবুকে এখন আমাদের ব্যাঙ্কে জমা দিয়েছো, চুরি গেলেও আমরা দায়ী।

বড়দি হেসে বললে, ব্যাঙ্ক বলিস না, চিড়িয়াখানা বল।

গৌরী হাসি চাপলে, তারপর দিদির কোল থেকে বাপ্পুকে নিয়ে মেঝের ওপর বসে পড়লো। তার সঙ্গে খেলা করতে শুরু করলো, হাসতে এবং হাসাতে।

বেশ লাগছে ওর। সমস্ত বাড়িটায় যেন একটা আনন্দের ঢেউ এসেছে। দিদিকে ওরা সবাই ভালোবাসে, ব্যারাকপুর থেকে আজ-

কাল আর ঘন ঘন আসা-যাওয়া হয়ে ওঠে না, তাই দিদি কখনো সখনো এসে হাজির হলেই সকলে খুশী হয়ে ওঠে।

কিন্তু সে এক অন্য আনন্দ।

দিদিকে দেখলে ওদের সকলের মনেই একটা পরিপূর্ণতা আসে, যেন হারিয়ে যাওয়া সেই পুরোনো দিনগুলোকে ফিরে পায়। তার ওপর বাপ্পু।

গৌরীর কাছ থেকে তাকে কেড়ে নেবার চেষ্টা করলো গীতা আর আরতি। আরতির সঙ্গেই তার সবচেয়ে বেশী ভাব।

গৌরী গীতা হাত বাড়ালেও নির্বিকার থাকে ছেলেটা, কিন্তু আরতি কাছে গেলেই কোলে ঝাঁপিয়ে পড়তে চায়।

হিমানীশ ঠাট্টা করে বললে, সমবয়েসী তো, সেইজন্যে আরুকেই এত পছন্দ।

আরতি চোখ পাকালো। ক্লাস এইটে পড়ছে সে, ফ্রক পরে বলেই কিনা বাপ্পুর সমবয়েসী হয়ে গেল!

এদিকে পান দেবার কথা সকলেই ভুলে গিয়েছিল।

হিমানীশ তাই পেয়ালার চা-টা শেষ করে বললে, দ্যাখো, এখনো পান দিলো না কেউ!

আরতি ফোঁস করলে।—আপনার বউকে বলুন না মশাই!

গৌরী তাড়াতাড়ি উঠে বললে, থাক্, থাক্, আমি এনে দিচ্ছি।

আর পিছনে পিছনে গঙ্গাও। বিয়ের আগে গঙ্গা আর গৌরীর ছিল যত ভাব, যত গোপন শলাপরামর্শ, যত রঙ্গরসিকতা। অথচ কি করে যেন দু'জনে ধীরে ধীরে পৃথক হয়ে গেছে। ঠিক সেই আগের দিনে যেন ফিরে যেতে পারে না।

কিন্তু আজ জামাইবাবুর উপস্থিতিতে সমস্ত আবহাওয়াটাই বদলে গেছে। এমন কি গৌরীর কপালের দুশ্চিন্তার রেখাটাও একটু একটু করে দূর হয়ে গেছে।

এ-আনন্দের কোনো তুলনা নেই। দেওয়ালির দিনে সারি সারি

প্রদীপ জ্বলতে দেখলে যে আনন্দ, দিদি এলে তেমনি ভালো লাগে। আর অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ একটা তুবড়ি জ্বলে উঠলে যেমন ফুর্তি লাগে, জামাইবাবু এলে তেমনি।

গৌরীরও যেন তেমনি ভালো লাগছে।

তাড়াতাড়ি পানটা সেজে নিয়ে ফিরে এলো গৌরী। পিছনে পিছনে গঙ্গা। গৌরীকে অনেক কিছু প্রশ্ন করবার আছে, অনেক কিছু জানতে চায় সে। হয়তো ব্যথার ভাগ নিতে চায়, শুভ পরামর্শ দিতে চায়। কিন্তু সুযোগ মিলছে না।

গৌরী ফিরে এসে জামাইবাবুকে পানের প্লেটটা দিলো। তারপর আবার গিয়ে বাপ্পুর কাছে বসলো।

আর গঙ্গা গিয়ে দাঁড়ালো বারান্দায়। চার পাশে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখলো। কত বদলে গেছে রাস্তাটা। কত নতুন নতুন বাড়ি উঠেছে, বস্তির খানিকটা সাফ হয়ে গেছে, নতুন রাস্তা বেরিয়েছে ওদিক দিয়ে।

এই তো বছর খানেক আগে এসেছিল ও, তার পরেও কত বদলে গেছে।

একটু একটু করে কত কথা মনে পড়লো গঙ্গার। একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

রঞ্জিৎকে যখন ভালোবাসলো গৌরী, বিয়ে করবে বললো, তখন খুব আনন্দ হয়েছিল গঙ্গার। মাঝে মাঝে যখনই এসেছে একটু একটু করে শুনেছে তার কথা, তাদের কথা, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে কত কি প্রশ্ন করেছে, প্রত্যেকটি গোপন আলাপ, সুন্দর সুন্দর অর্থহীন কথা —শুনে ভালো লেগেছে।

গঙ্গা এ-সব সুযোগই পায় নি, নিজের পছন্দমতো কাউকে বিয়ে করার কথা ভাবতে পারে নি, কোনো একজনকে পছন্দ করার কথা মনেও আসে নি। বাবা-মা বিয়ে ঠিক করেছেন, যথারীতি শাঁখ বেজেছে, মন্ত্র পড়েছে, ঘর-সংসার করতে গেছে অচেনা মানুষটির সঙ্গে।

তারপর ?

তারপর কোনো কোনোদিন হঠাৎ হিমানীশের সঙ্গে মনোমালিন্য হয়েছে, ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে তুচ্ছ কারণে, আর তখন অকস্মাৎ কোনোদিন মনে হয়েছে, গৌরী সুখী, গৌরীর জীবনে যতিভঙ্গ নেই—একসুরে দুটি জীবন বাঁধা হয়ে গেছে। সে-কথা ভেবে অদ্ভুত একটা সুখ অনুভব করেছে গঙ্গা—গৌরী সুখী হয়েছে সে-কথা ভাবতেও আনন্দ।

কিন্তু তারপর কি যে হয়ে গেল, কি হয়েছে—কিছুই জানে না সে। কেন এমন হলো!

ধীরে ধীরে আবার ফিরে এলো সে। ঘড়ির দিকে তাকালো।

গায়ত্রীকে বললে, চান করবে না তোর জামাইবাবু, একটা কাপড় এনে দে।

বলে স্যুটকেস থেকে তেলের শিশি আর গামছা বের করলে। হিমানীশকে বললে, ওঠো, চান করে নাও, খেতে দেরি হয়ে যাবে তোমার।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠলো হিমানীশ।

কলঘরের বাইরে ধুতিটা হাতে করে দাঁড়িয়ে আছে দিদি, গৌরী একসময় দেখলো। এমন পতিসেবা দেখলে কার না হাসি পায়!

বাথরুমের ভিতর থেকে জলের শব্দ আর জামাইবাবুর গুনগুনুনি আসছে।

একে একে স্নান খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেল সকলের। দুপুর নিঃঝুম হয়ে পড়লো।

ও-ঘরে জামাইবাবুর সঙ্গে সকলে ঘন হয়ে বসে চাইনীজ চেকার খেলছে। হাসিঠাট্টা, উল্লাসের চিৎকার আসছে থেকে থেকে।

এ-ঘরে গৌরী আর গঙ্গা শুয়েছে মাদুর বিছিয়ে।

এলোমেলো, আজেবাজে দু'চারটে কথা। গৌরীর বোধহয়

ঘুম আসছে। বাপ্পুর গায়ে হাত রেখে ঘুম-ঘুম চোখে কথা বলছে সে দিদির সঙ্গে।

হঠাৎ গৌরীর গায়ে হাত দিয়ে ঝাঁকুনি দিলো গঙ্গা। চোখ মেলেও পিছন ফিরেই শুয়ে রইলো সে।

আর দিদি বললে, গৌরী, সত্যি করে বল তো কি হয়েছে তোর? কি হলো! ঝগড়া?

কিছুক্ষণ চুপচাপ স্থির হয়ে রইলো গৌরী, কোনো উত্তর দিলো না। তারপর হঠাৎ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

মনোরঞ্জনবাবু সন্ধ্যের সময় আপিস থেকে ফিরলেন গলদঘর্ম হয়ে। কোনো রকমে পা টেনে টেনে বাড়ি পৌঁছনো। শরীরে এতটুকু শক্তিও যেন অবশিষ্ট নেই।

প্রথম প্রথম বাড়ি ফিরেই পাখাটা একবার চালিয়ে দিয়ে স্থির হয়ে একটু বসতেন। বসতেন না, ধুঁকতেন বসে বসে। তারপর জামাকাপড় ছেড়ে গামছাটা নিয়ে কলঘরে স্নান করতে গিয়েই চিৎকার করতেন। প্রায় কান্নার মতো শোনাতো চিৎকারটা। কারণ, তখন আর চৌবাচ্চায় জল থাকতো না এক বালতি। যেটুকু বা থাকতো তাও সাবান গোলা।

বিকেল হতে না হতে তাড়াতাড়ি গা ধুয়ে নিতো সবাই। গীতা গায়ত্রী থেকে অঞ্জু আরতি অবধি সকলেই। কে আগে যেতে পারে, কে কাকে ঠকিয়ে দু'মগ জল বেশী ঢালতে পারে তার প্রতিযোগিতা চলতো।

মনোরঞ্জনবাবু যে ঘেমে নেয়ে সারা দিন পচা ভ্যাপসা গরমে কাটিয়ে ফিরবেন, তাঁর জন্যে যে একটু জল রেখে দেওয়া দরকার কেউ ভেবে দেখতো না।

এমনিতেই এই গরমের সময়টা চুঁয়ে চুঁয়ে জল পড়ে কল থেকে, কোনো কোনোদিন চৌবাচ্চা ভর্তিই হয় না। তার ওপর এতগুলি মানুষ বাড়িতে।

জলের অভাবে বাড়িসুদ্ধ লোকের মনমেজাজ ক্ষেপে থাকে, মনোরঞ্জনবাবু তাই আর অনুযোগ করতেন না।

তাঁর কথা মেয়েরা ভেবে দেখবে না, উল্টো দু'চারটে কথা শুনতে হবে। ইলেক্‌ট্রিক পাম্প বসানো হয় না কেন, জলের পাইপটা একটু বড়ো করালে দোষ কি! সামান্য ক'টা টাকা ঘুষ দিলেই তো ব্যবস্থা হয়ে যায়; ইত্যাদি। কথাগুলো মনোরঞ্জনবাবু সামর্থ্যের ওপরই কটাক্ষ করে।

তাই চুপ করে থাকতেন, মেয়েদের স্নান শেষে যেটুকু সাবানের ফেনা মাখা ঘোলা জল পড়ে থাকতো তাতেই কোনোরকমে স্নান সারতেন।

গৌরী আসার পর একটু পরিবর্তন হয়েছিল। সকলকে বাবার কথাটা ও স্মরণ করিয়ে দিতো। বাথরুমে দরজায় কান পেতে হাঁক দিতো, এই অঞ্জু, কত জল ঢালছিস, সকলকে চান করতে হবে না?

বাবার সামনেও একদিন বলে ফেলেছিল।—সারাদিন খেটেখুটে আসো তুমি, ওদের এটুকু বুদ্ধিও নেই যে···

মনোরঞ্জনবাবু হেসেছিলেন।—খেটেখুটে? খাটুনি আপিসে তো নেই মা, আজকাল!

গৌরী বুঝতে পারে নি।

মনোরঞ্জনবাবু পরিষ্কার করে বলেছিলেন, সব ভুল! আপিসে যাই আজকাল, কাজ কেউই করি না। কাজ করার শক্তিই থাকে না।

অশোকা দেবী কাছেই ছিলেন, হেসে প্রশ্ন করেছিলেন, তবু মাইনে দেয়?

—দেয়। কাজ তো কেউ চায় না, ঠিক সময়ে গেলাম কিনা,

ঠিক সময়ে চেয়ার ছেড়ে উঠলাম কিনা এইটুকু দেখেই সন্তুষ্ট। আর কাজ হবে কি করে! সকালে বাসে ট্রামে যে-ভাবে ধ্বস্তাধ্বস্তি করে যেতে হয়, আপিসে পৌঁছে জিরোতেই তো দু'ঘণ্টা, তারপর আপিসের গরম।

একটু থেমে বলেছিলেন, আগে এত গরম লাগতো না, অফিসারদের সব এয়ার-কণ্ডিশন করা ঘর, দু'একবার তো ঢুকতে হয়, তাই আজকাল গরমটা বেশী লাগে। হিংসেয়।

—বাঃ রে, সব আপিসটা এয়ার-কণ্ডিশন করে না কেন? গৌরী অনুযোগ করেছিল।

হেসেছিলেন মনোরঞ্জনবাবু।—তাই কখনো পারে, কত খরচ, অফিসারদের মোটা মোটা মাইনে দিতে হবে না? নবাবী-রাজত্ব চলছে এখন, বুঝলি, নবাবী-রাজত্ব। আমরাও শোধ তুলছি, যেটুকু না করলে নয় ঢিমিয়ে ঢিমিয়ে করি। সারাদিন গল্পগুজব করে কাটাই, গরমটা ভুলতে হবে তো।

শুনে অশোকা দেবী হেসে উঠেছেন, গৌরী খুশী হয়েছে। বলেছে, এতকাল খদ্দর পরেছে কত কষ্ট করে, এখন একটু আরাম করবে না?

ঠাট্টা শুনে খুশী হয়েছেন মনোরঞ্জনবাবু।—শুধু ওরাই নয়, সাকরেদরাও এখন নবাব হয়ে গেছে রে! ছুটি হবার আগেই সব গাড়ি নিয়ে সুরুৎ সুরুৎ করে সরে পড়েন, আর আমাদের অবস্থা যদি দেখিস, দেড় ঘণ্টা দু'ঘণ্টা ধরে ছোটাছুটি করে দাঁড়িয়ে থেকে তবে ভিড় ঠেলে একটা বাস পেয়ে গেলে সেদিনকার মতো স্বর্গলাভ।

শুনে দীর্ঘশ্বাস ফেলেছে গৌরী। রাস্তায় ঘাটে আপিস-টাইমের ভিড় ও দেখেছে, ছোটাছুটি ঝোলাঝুলি দেখে কৌতুকে হেসেছে। বাবার কথায় সে-দৃশ্যটাকে যেন নতুন করে দেখতে পেয়েছে।

মনোরঞ্জনবাবু মৃদু হেসে বলেছেন, ভিড় ঠেলে আপিসে গিয়ে ক্লান্ত হয়ে বসে থাকি, জল খাই, পাখার বাতাস খাই, আবার ভিড় ঠেলে বাড়ি ফিরে ক্লান্ত হয়ে পড়ি···

গৌরী হেসে উঠে বলেছে, কিন্তু চান করার জলটুকুও পাও না। বাড়ির চেয়ে আপিসই ভালো, কি বলো ?

সেদিনের পর থেকেই বিকেলের স্নানের জলটুকুর দিকে চোখ পড়েছে গৌরীর। সকলকে ধমকে দিয়ে বাথরুমের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে হিসেব রাখতে শুরু করেছে কে কতটা জল নিচ্ছে। চৌবাচ্চায় সাবানের ফেনা পড়লে ধমক দিয়েছে।

কিন্তু জামাইবাবু আর দিদি আসায় সেটুকু জলও আজ রাখা যায় নি। আর অত কম জলে স্নান করে তৃপ্তিও পায় নি জামাইবাবু।

বলেছে, তোমাদের এখানে বাসা ভাড়া পেলে ট্র্যান্সফার নেবে ভেবেছিলাম, কিন্তু আর নয়। ভদ্রলোকে এ-শহরে বাস করতে পারে না।

শুনে গায়ত্রী মুখ ভেংচেছে, ইস কি ভদ্রলোকের জায়গায় থাকেন উনি।

গৌরীর কথাটা ভালো লাগে নি। নানান অসুবিধে এখানে, ট্রামবাসে ওঠা যায় না, কলে জল নেই, রাস্তায় নোংরা ডাস্টবিন, কুকুর আর ষাঁড়ের রাজত্ব, তবু, তবু মনের কোণে কোথায় যেন কোলকাতা শহরটার জন্যে অফুরন্ত ভালোবাসা জমা হয়ে আছে। বাইরের লোক নিন্দে করলে গায়ে লাগে।

গৌরী তাই কোনো জবাব দেয় নি, চুপ করে থেকেছে। শুধু মনে মনে ভেবেছে, বাবা ফিরে এলে কি করে স্নান করবে।

মনোরঞ্জনবাবু তাই ধুঁকতে ধুঁকতে যখন ফিরে এলেন, যখন দেখে মনে হলো শরীরে এতটুকু শক্তি নেই আর, তখন পাখাটা খুলে দিয়েই গৌরী হাসতে হাসতে বললে, আজ আর তোমার জল নেই।

না থাক, মনোরঞ্জনবাবুর মুখ হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠলো বড় মেয়ে গঙ্গাকে দেখে।

গঙ্গা এসে পা ছুঁয়ে প্রণাম করলো। জিগ্যেস করলে, তোমার শরীর ভালো আছে ?

আরতি ততক্ষণে বাপ্পুকে নিয়ে কাছে এসে দাঁড়িয়েছে।

পাঞ্জাবি আর গেঞ্জীটা খুলে গৌরীর হাতে দিয়েই বাপ্পুর দিকে হাত বাড়ালেন, অরে দাদু এসেছে আমার, দেখি দেখি···

গৌরীও খুশী হয়ে উঠলো। যে-মানুষটা একটু আগে ক্লান্তিতে অবসন্ন হয়ে পড়েছিল, দিদিকে দেখে বাপ্পুকে দেখে তার সমস্ত চেহারাটাই যেন বদলে গেছে।

বাপ্পুকে আদর করতে করতে মনোরঞ্জনবাবু হঠাৎ বলে বসলেন, আজ আর ছেলে পড়াতে যাবো না।

সন্ধ্যের পর গরমে থাকতে না পেরে গৌরী গীতারা জামাইবাবুর সঙ্গে কাছের পার্কে বেড়াতে বেরিয়ে গেল। শুধু গঙ্গা গেল না। বাবা আজ ছেলে পড়াতে যায় নি, আর রাতের রান্নায় মাকে সাহায্য করতে হবে। এতগুলি লোকের রান্না।

গঙ্গা দেখলে বাবা বাপ্পুকে নিয়ে মেতে আছে। ও তাই বারান্দায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

দেখলে, মাও ওর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে।

অশোকা দেবী খানিক চুপ করে থেকে প্রশ্ন করলেন, হ্যাঁ রে, গৌরী কিছু বললে ?

কি আর বলবে গৌরী, কিই বা বলার আছে !

ও নিজেই কি জানতো এমন হবে, এ-ভাবে রঞ্জিৎই একদিন ওর চোখে দুঃসহ হয়ে দাঁড়াবে।

সেই দিনগুলির কথা হঠাৎ কখনো কখনো মনে পড়ে যায়, আর তখন আক্রোশে বিষিয়ে ওঠে ওর সমস্ত শরীর !

মনে হয়, রঞ্জিৎ বুঝি ওকে প্রথম থেকেই বঞ্চনা করেছে।

ধাপে ধাপে ও এগিয়ে গেছে মোহাবিষ্টের মতো। তারপর একসময়···

না। সব অপরাধ রঞ্জিতের ঘাড়ে তুলে দিয়ে লাভ নেই। ও নিজেও কি প্রলুব্ধ হয় নি? কোথাও কি কোনো একটা ক্ষীণ রোমাঞ্চের শিখা ওকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যায় নি?

তা হ'লে সেই প্রথম দিন ছাদ থেকে নামবার সময় রঞ্জিৎ যখন সকলের অলক্ষ্যে ওর ছবি তুলেছিল তখন লজ্জা আর অস্বস্তির মধ্যেও কৌতুক বোধ করেছিল কেন? কেন রঞ্জিতের স্টুডিওয় বসে একটার পর একটা ছবি তুলতে দিয়েছিল? কলের পুতুলের মতো, কিংবা তাও নয়, শুধুই একটা মাটির পুতুলের মতো রঞ্জিতের ক্যামেরার সামনে কেন নিজেকে মেলে ধরেছিল? আর কেনই বা সে-কথা বাড়ি ফিরে মা-বাবা ভাইবোনেদের কাছে প্রকাশ করে বলতে পারে নি?

সে-সব কথা আজ মনে পড়লে নিজের ওপরই ক্রুদ্ধ হয়ে ওঠে গৌরী। অথচ সেদিন···

হ্যাঁ, একটু একটু করে কি-ভাবে যেন ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল।

আসলে রঞ্জিতের সহজ সরল ব্যবহার, কিংবা অতিরিক্ত স্মার্টনেসই তার জন্যে দায়ী।

গ্রুপ ফটোখানা একদিন নিয়ে গেল গৌরী, দিদি জামাইবাবু সে-ছবি দেখে খুশী হয়েছিল। গৌরীর তখন কেবলই ইচ্ছে হচ্ছিল, ওর ছবিগুলোও দেখায়। দেখিয়ে বলে, আরো অনেক ভালো ছবি তুলতে পারে রঞ্জিৎ। কিন্তু সে-কথা প্রকাশ করতে পারে নি, বলতে পারে নি, বাড়ির কাউকে না জানিয়ে ও নিজেও অসংখ্য ছবি তুলিয়েছে।

তাই ওর নিজের ফটোগুলো রীতিমতো লুকিয়ে লুকিয়ে রাখতে হয়েছে।

এদিকে প্রতিদিনই কলেজ থেকে ফেরার পথে ইচ্ছে হয়েছে,

একবার রঞ্জিতের স্টুডিওয় উঁকি মেরে আসে, দুটো কথা বলে। কিন্তু পারে নি। কেমন একটা অস্বস্তি, নিজের গোপন মনের দুর্বলতা প্রকাশ করে ফেলার লজ্জা।

কিন্তু রঞ্জিৎ যে এ-ভাবে এগিয়ে আসবে, ভাবতেই পারে নি।

কলেজে যাবার সময়টা সাধারণত দল বেঁধেই যেতো গৌরী। এ-গলি ও-গলি থেকে দু'একজন করে এসে জুটতো। হাসাহাসি, গল্প, নানান রসিকতায় সমস্ত পাড়াটা সে-সময় এক ঝাঁক পাখির কলকাকলীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠতো। শুধু ফেরার সময়ই একসময় একা হয়ে পড়তো গৌরী। সে-সময় কখনো কখনো রঞ্জিতের কথা মনে পড়তো।

কিন্তু সকলের সামনেই রঞ্জিৎ এ-ভাবে ডেকে বসবে ও ভাবতেই পারে নি।

ওরা তিনটি মেয়ে কলেজে যাচ্ছিল, হঠাৎ দেখলে রঞ্জিৎ আসছে।

মুখোমুখি হলেই ও একটু মৃদু হেসে হয়তো শুধুই পরিচয়ের স্বীকৃতিটুকুই দিতো, আশা করেছিল রঞ্জিৎ তার বেশী দুঃসাহস দেখাবে না।

কিন্তু কাছে আসতেই রঞ্জিৎ মৃদু হেসেই বলে বসলো, শুনুন।

গৌরীকে থেমে পড়তে হলো।

সঙ্গের মেয়ে দুটি নিজেদের মধ্যে চোখ চাওয়া-চাওয়ি করে দূরে সরে গেল।

একজন অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো।

অন্যজন বললে, যাঃ, আত্মীয় হয়তো।

কিন্তু গৌরীর কানে গেল না সে-কথা। ও শুধু হেসে বললে, কোথায় গিয়েছিলেন ?

কথা নয়, কথার কথা।

কিন্তু উত্তরটা এমন আসবে আশঙ্কা করে নি।

রঞ্জিৎ বললে, যাই নি কোথাও, আপনার জন্যেই অপেক্ষা করছিলাম।

গৌরীর সারা শরীর শিউরে উঠলো।

রঞ্জিৎ থেমে থেমে বললে, কই আর একদিনও তো গেলেন না?

গৌরী ততক্ষণে একটু সপ্রতিভ হয়েছে। বিস্ময়ের ভান করে বললে, তাই টাকার তাগাদা দিতে এসেছেন? বলেই হেসে উঠলো। বললে, টাকা তো দিতে পারবো না বলেইছিলাম!

রঞ্জিৎ একটু গম্ভীর স্বরে বললে, না, অত তুচ্ছ জিনিসের জন্যে আসি নি।

—তবে?

—আপনার সঙ্গে আমার কিছু কথা আছে।

হঠাৎ একটা আতঙ্কের ছাপ পড়লো গৌরীর মুখেচোখে, হেসে হাল্কা হবার চেষ্টা করলে।—খুব গুরুতর কিছু নাকি!

রঞ্জিৎ কোনো উত্তর দিলো না এ-কথার।

বললে, বলুন কখন দেখা হবে।

গৌরী হেসে উঠলো।—দেখা তো হয়েছেই, এখনই বলুন না।

—না, একটু সময় লাগবে।

গৌরীর হাসিটা দপ্ করে নিভে গেল। কেমন যেন অপ্রতিভ বোধ করলো ও। একটু আতঙ্কও হয়তো। এতক্ষণ চেষ্টা করে যে হাসিটা চোখেমুখে এঁটে রেখেছিল সেটা নিজের অজান্তেই কখন খসে পড়েছে।

যে সহপাঠিনী দু'জন একটু দূরে সরে গিয়েছিল তাদের দিকে ফিরে তাকালো গৌরী। তারা অল্পক্ষণ অপেক্ষা করেই আবার হাঁটতে শুরু করেছে। বেশ খানিকটা দূরে চলে গেছে তারা।

গৌরী দাঁতে ঠোঁট কামড়ে কি যেন ভাবলো। রঞ্জিৎ কি বলবে সেটুকু শোনার আগ্রহ একদিকে, আরেক দিকে যা শুনতে চায় তা শোনার ভয়।

স্বপ্নের মুহূর্তটাকে একটু পিছিয়ে দিতে পারলেই যেন শান্তি।

ঠিক এই মুহূর্তে একটা বাস এসে দাঁড়ালো ওদের সামনে। গৌরী একটা কিছু বলে কলেজের দিকে পা বাড়াবে কিনা ভাবলো।

আর সেই মুহূর্তে রঞ্জিৎ বললে, চলুন।

বিস্ময়ের কৌতুকের হাসিতে গৌরী বলে উঠলো, কোথায়?

—আগে বাসে উঠুন, তারপর বলবো।

—বাসে! বিস্ময়ের স্বর ফুটলো গৌরীর গলায়। কিন্তু রঞ্জিৎ বাসটার দিকে এগিয়ে যেতেই গৌরীও ওর পিছনে পিছনে এগিয়ে গেল। যেন ওর নিজের ওপর কোনো হাত নেই, ইচ্ছে অনিচ্ছে নেই।

শেষ পর্যন্ত বাসে উঠে পড়লো ও বইয়ের রাশ বুকে চেপে। পিছনে পিছনে রঞ্জিৎ।

গোটা কয়েক স্টপ পার হয়ে এসে রঞ্জিৎ ইশারায় নামতে বললো গৌরীকে।

দু'জনেই নেমে পড়লো।

তারপর একটা ছোট চায়ের দোকান।

দু'পেয়ালা চা নিয়ে দু'জনে বসলো একটা কেবিনে।

এতক্ষণে অপ্রতিভ ভাবটা, মনের জড়তা খানিক কেটে গেছে।

চায়ের পেয়ালায় চামচ নাড়তে নাড়তে মাথা নিচু করে গৌরী ধীরে ধীরে বললে, বলুন, কি বলবেন!

রঞ্জিৎ এবার হেসে উঠলো সশব্দে।

চমকে চোখ তুললো গৌরী।

রঞ্জিৎ হেসে বললে, কিছু না।

—মানে? গৌরী নিজেও কৌতুক বোধ করলো। কিংবা বিস্ময়।

রঞ্জিৎ গৌরীর চোখে চোখ রেখে বললে, শুধু এখানে বসে দু'জনে চা খাবো বলেই এলাম।

গৌরী হেসে উঠলো। ওর মন থেকে একটা ভার নেমে গেল। আশঙ্কা সরে গেল।

একটুক্ষণ থেমে বললে, বাঃ রে, অতদূর থেকে এসে···তা হলে শুধু চা কেন?

বলে দু'জনেই সশব্দে হেসে উঠলো কৌতুকে।

কিন্তু এই কৌতুকে আর হাসির মধ্যে দিয়েই দিনে দিনে কেমন করে যে ওরা ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠলো, কেমন করে দিনে দিনে স্বপ্ন গড়ে তুললো, গৌরী নিজেও যেন বুঝতে পারে নি।

তবু এও এক নেশা। তীব্র নেশা।

সুযোগ পেলেই দু'জনে নির্দিষ্ট সময়ে দেখা করেছে, কখনো কলেজ ফাঁকি দিয়ে এসেছে গৌরী, কখনো বা বিকেলে সন্ধ্যায় কোনো বন্ধুর বাড়ি থেকে বই নিয়ে আসার নাম করে এসে দেখা করেছে গলির মোড়ে।

দুপুরের ছায়াভেজা গলি ধরে ধরে হেঁটেছে পাশাপাশি, পার্কের বেঞ্চে, গড়ের মাঠের ঘাসের সবুজে, লেকের ধারে ধারে।

কোনো কোনোদিন ম্যাটিনি শোয়ের সিনেমায়। সিনেমা ঘরের অন্ধকার ওদের দু'জনকে কাছে এনে দিয়েছে।

—আজ যা মুশকিলে পড়েছিলাম, গীতাটা কিছুতে ছাড়ছিল না, আমার সঙ্গে আসবেই।

—এলে কি করতে?

—কি আর করতাম, সত্যিই বন্ধুর বাড়ি যেতে হতো, বই নিয়ে আসতে হতো।

—আর আমি দাঁড়িয়ে থেকে থেকে ফিরে যেতাম, এই তো!

—সেদিন খুব রাগ করেছিলেন, না? সত্যি কিছুতেই আসতে পারলাম না। পাড়ার ছেলে দুটো এমন পিছনে লাগলো, যেদিকে যাই পিছনে পিছনে আসে।

কিংবা অন্য কোনোদিন:

—পরীক্ষা এসে গেল, আর কিন্তু পড়াশুনায় মন না দিতে পারলে স্রেফ ফেল।

—বেশ তো, তা হলে আর এখন দেখা করবো না।

—বাঃ রে, তা হলে তো আরো মন বসবে না বইয়ের পাতায়।

—না, না, ভালো করে পড়াশুনো করো।

—খুব হয়েছে, আপনাকে আর উপদেশ দিতে হবে না। মাস্টার মশাই হয়েছেন!

—মাস্টারমশায়ের কাছে যাচ্ছি বলেই তো বেরিয়েছিলে। কেউ দেখতে পায় তো···

—আপনাকেই প্রফেসর ঘোষ বানিয়ে দেবো। বলবো, পার্কে বসে খুব ভালো পড়া হয়।

—হাসি নয়, দেখতে পেলে কিন্তু সব বন্ধ হয়ে যাবে।

সব স্বপ্ন ভেঙে যাবে, সব হাসি আনন্দ থেমে যাবে—সে আশঙ্কা ছিল না এমন নয়। আর এই আতঙ্ক, এই ভয় ছিল বলেই হয়তো নেশাটাও এত তীব্র ছিল।

একটা দিন দেখা না হলে সমস্ত মন বিস্বাদে ভরে যেত গৌরীর। কোনো কোনোদিন এসে দাঁড়িয়েছে নির্দিষ্ট জায়গাটিতে। ঘন ঘন ঘড়ির কাঁটার দিকে তাকিয়েছে, আর শেষ অবধি কোনো কারণে হয়তো রঞ্জিৎ এসে পৌঁছতে পারে নি। সেদিন অসহ্য ক্রোধে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয়েছে গৌরীর। প্রতিজ্ঞা করেছে আর কোনোদিন ও আসবে না, খোঁজ নেবে না রঞ্জিতের, সব সম্পর্কে পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবে। কিন্তু পারে নি।

আবার কোনো কোনোদিন হয়তো গৌরীই ঠিক সময়ে এসে পৌঁছতে পারে নি। নির্দিষ্ট সময়ের অনেক পরে এসে অপেক্ষা করেছে, চারিদিকে অনুসন্ধানী চোখে তাকিয়ে তাকিয়ে খুঁজেছে রঞ্জিৎকে। পায় নি।

না, অপেক্ষা করে করে বিরক্ত হয়েই ফিরে গেছে রঞ্জিৎ।

পরে যখন দেখা হয়েছে আবার, ক্রোধে ফেটে পড়েছে রঞ্জিৎ। শুনতে চায় নি, কেন আসে নি সে, কিংবা কেন দেরি হয়েছিল তার আসতে।

তারপর একটু একটু করে রাগ পড়েছে তার।

এমনি করেই দিনের পর দিন কেটে চলেছিল ছ'জনের। ইতিমধ্যে পরীক্ষা হয়ে গেল, পাসের ফল বের হলো।

গৌরী বাবাকে বললে, চাকরি করবো।

একটা ভয়ঙ্কর খবরের মতো এই ছোট্ট একটা খবরে সারা বাড়ি তোলপাড় হয়ে গেল।

না, না, না।

কেউ মত দিলো না। কেন, চাকরি করবে কেন গৌরী। এ-বাড়ির মেয়েরা কোনোদিন চাকরি করে নি। করার প্রয়োজন নেই।

আশ্চর্য! সামান্য একটা চাকরি করতে চেয়ে মনে হয়েছিল গৌরী যেন একটা ভীষণ অন্যায় করে ফেলেছে।

কিন্তু তার বেশ কিছুদিন পরে দিদির কানে একান্তে গোপনে যখন ও রঞ্জিতের কথা প্রকাশ করে বললে, দিদি মা'র কানে তুললো কথাটা, মা বাবার, তখন—তখন ও যা কিছু আশঙ্কা করেছিল, যতখানি ভয় পেয়েছিল সব মিথ্যা হয়ে গেল।

মা আর বাবার মধ্যে কি কথা হয়েছিল গৌরী জানে না। শুধু জানে, দিদি একদিন বললে, বেশ তো, রঞ্জিৎকেই বিয়ে কর না তুই, আমি বলছি কেউ আপত্তি করবে না।

তখন অবশ্য একবার একটা সন্দেহ উঁকি দিয়েছিল গৌরীর মনে।

বাবা মা অমত করবে না? কেন? বাবা মা গৌরীর বিয়ে দিতে পারছেন না বলেই কি? বিয়ে দিতে হলে বেশ কিছু টাকা খরচ হবে বলে? না কি তাঁদের মন থেকেও সব সংস্কার ধুয়ে মুছে গিয়েছিল!

সেদিন খুশী হয়েছিল গৌরী, শ্রদ্ধায় ভালোবাসায় মন ভরে উঠেছিল বাবা মা'র ওপর। আর আজ মনে হয়, সেদিন অত সহজে বাবা মা এ বিয়েতে মত না দিলেই হয়তো ভালো হতো।

আতঙ্কের মধ্যেই একটির পর একটি দিন কেটেছিল গৌরীর। কত গোপন, কত বাধাবিপত্তি সরিয়ে দেখা করতো সে রঞ্জিতের সঙ্গে।

অনেক, অনেক পরে গীতার কাছে অভ্যাসে দু'একটা কথা জানিয়েছে। পরিবর্তে শুনতে চেয়েছে গীতার গোপন মনের কাহিনী।

তারপর একদিন দিদির কাছে খুলে বলেছে সব কথা। কি ভীষণ একটা আতঙ্ক ছিল ওর মনে। না জানি, এমন কথা শুনে বাবা-মা কতখানি রাগে ফেটে পড়বে। ভেবেছিল, হয়তো বাবাও বকুনি দেবেন। হয়তো বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথ বন্ধ হয়ে যাবে, রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের পথে বাধা পড়বে।

সে-সব দিকও ভেবে রেখেছিল ও। কিন্তু কিছুই তো হলো না।

দিদিই একদিন বললো, বাবা-মা'র সম্পূর্ণ মত আছে এ-বিয়েতে।

তখন খুব খুশী হয়েছিল গৌরী। কিন্তু পরে, ওর মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে বাবা-মা এত উদার হয়ে গেল কেন, উদার হয়ে গেছে কবে থেকে!

ওর বিয়ের জন্যে বাবা-মা'র ভাবনা তো কম ছিল না। দু'এক জায়গায় কথাও হয়েছে। দু'একজন মেয়ে দেখতেও এসেছিল। সে-সব দিনে ভীষণ ভয় হতো ওর। যদি পছন্দ হয়ে যায় তাদের, যদি বিয়ে ঠিক হয়ে যায়। কিন্তু না, মেয়ে পছন্দ হয়েছে কি হয় নি জানা যায় নি। দেনাপাওনার কথাতেই বাবা পিছিয়ে এসেছে।

তবে কি নিজে বিয়ে দিতে পারছিল না বলেই ওরা মত

দিয়েছিল ? পনের টাকাটা দিতে হবে না বলেই ? না কি রঞ্জিৎকে স্বজাতি এবং ভালো পাত্র বলেই মত দিয়েছিল ?

এ-বিয়েতে যখনই অসুখী বোধ করেছে গৌরী, যখনই ব্যর্থতার যন্ত্রণা বোধ করেছে তখনই এ-সব কথা মনে উঁকি দিয়ে গেছে। যা একদিন তার কাছে বাবা-মা'র মনের ঔদার্য মনে হয়েছিল তাই হয়ে উঠতো স্বার্থপরতা।

মনোরঞ্জনবাবু তাই হিমানীশকে উদ্দেশ করে যখনই গৌরীর চাকরির কথাটা পাড়লেন তখনও গৌরী অস্বস্তি বোধ করলো। হঠাৎ মনে হলো, বাবা এত স্বার্থপর! শুধু তু'বেলা তু'মুঠো ভাত, এছাড়া আর তো কিছুই চায় নি ও, আশা করে নি।

নেহাত কথার ছলেই অবশ্য প্রশ্নটা তুললেন মনোরঞ্জনবাবু।

বললেন, গৌরী তো বি-এ পাস করেছে, ও একটা চাকরি করলে···তুমি কি বলো হিমানীশ ?

হিমানীশ সায় দিলো।—সে তো ভালোই। গৌরী তো নিজেই একবার চাকরি করতে চেয়েছিল।

গৌরী মাথা নিচু করে যেমন বসেছিল মোড়াটার ওপর, তেমনি বসে রইলো। কোনো কথা বললে না। সেদিন চাকরি করতে চাওয়ার সঙ্গে আজকের দিনটার কোনো মিল আছে নাকি ?

মনোরঞ্জনবাবু বললেন, আমি এক জায়গায় আশা পেয়েছি, তুমিও দেখো একটু, তোমার তো অনেক জানাশোনা আছে।

এতক্ষণে উত্তর না দিয়ে পারলো না গৌরী।

বললে, চাকরির জন্যে এত ধরাধরির কি আছে। আমি নিজেই যোগাড় করে নেবো।

হিমানীশ হাসলো। বললে, তা ঠিক। চেষ্টা করলে ঠিক পেয়ে যাবে।

মনোরঞ্জনবাবু আপিস চলে যাওয়ার পর ওই প্রসঙ্গটাই তুললো হিমানীশ।

গীতা আর গায়ত্রীদের সামনেই হাসতে হাসতে গৌরীকে কাছে টেনে নিয়ে তার পিঠের ওপর দিয়ে হাতখানাকে নিয়ে গিয়ে গৌরীর বাঁ হাতের কনুইটা চেপে ধরলো। পিঠের ওপর হাতের স্পর্শ পেতেই গৌরী ছটফট করে সরে যাবার চেষ্টা করলে।

গঙ্গা বাপ্পুকে কোলে নিয়ে ঘরে ঢুকতেই হিমানীশ বললে, গৌরীর কি রকম রূপের অহঙ্কার জানো ?

গঙ্গা ক্ষণিকের জন্যে অস্বস্তি বোধ করলো। গৌরীকে নিয়ে হিমানীশ বহুবার বহু হাসিঠাট্টা করেছে, কিন্তু এখন যেন ঠিক সেই সময় নয়।

তবু মুখে হাসি টেনে বললে, রূপ থাকলে অহঙ্কার থাকবে না কেন !

হিমানীশ কৌতুকের সুরে বললে, আহা, আমার কাছে অহঙ্কার দেখাবে না কেন। তা বলে যারা চাকরি দেবে তারাও ওর···

গঙ্গা বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে তকালো।

হিমানীশ হেসে বললে, গৌরী বলেছে ওর চাকরির জন্যে কাউকে খোঁজ করতে হবে না, ও নিজেই জুটিয়ে নিতে পারবে।

—পারবেই তো, বি-এ তো পাস করেছে। গঙ্গা বাধা দিলো।

গৌরী এতক্ষণে চুপ করে ছিল। কিংবা রসিকতায় ঠোঁট টিপে হাসছিল।

বাহুতে জামাইবাবুর মুখর আঙুলের ঈষৎ চাপ পড়তেই হিমানীশের হাতটা সরিয়ে দিয়ে বললে, বোধহয় একটু বিদ্রূপের স্বরেই বললে, যারা চাকরি দেয় তারা তো সব আপনার মতোই।

গঙ্গা, গীতা, গায়ত্রী সকলেই হোহো করে হেসে উঠলো। আর তো দেখে বাপ্পুও।

শুধু আরতি বুঝতে না পেরে, কিংবা ও হয়তো শোনে নি সব কথা, বললে, কি হলো ছোটদি ? হাসছো কেন ?

আর অঞ্জলি ধমক দিলো বাপ্পুকে।—এই! হাসছে দেখো! বাপের সঙ্গে ইয়ার্কি হচ্ছে!

গৌরীও ততক্ষণে সরে দাঁড়িয়ে হাসছে।

আশ্চর্য, ও কিছুতেই যেন হিমানীশের ওপর রাগ করতে পারে না। মুহূর্তের মধ্যে সব রাগ মুছে যায় মন থেকে।

দিদির বিয়ের পর থেকেই জামাইবাবুর সঙ্গে এমন একটা বিচিত্র সম্পর্ক গড়ে উঠেছে যার কোনো অর্থ খুঁজে পায় না ও।

দূরে সরে যেতেও ইচ্ছে হয় না, কাছে আসতেও কেমন একট বাধা। কিংবা অনিচ্ছাই হয়তো।

গৌরী তখন থেকেই বেশ বুঝতে পারে, হিমানীশের চোখের ভাষায়, হাসিঠাট্টার আড়ালে, তার হাতের আঙুলের স্পর্শ-লোলুপাতায় কি যেন আছে।

লোভ? হয়তো তাই।

এই সব মুহূর্তগুলিতে বেশ মজা লাগে গৌরীর। কৌতুকই বোধহয়। কখনো কখনো সামান্য প্রশ্রয়ের ভঙ্গিও ফুটে উঠেছে ওর ব্যবহারে। তারপর যেই একটু কাছে এগিয়ে আসতে গেছে হিমানীশ, ওর বেণী ধরে কাছে টেনেছে, কাঁধে হাত রাখতে গেছে, তখনই সশব্দ ধমকের ভান করে, কিংবা চট করে তার হাত থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে এমনভাবে সরে গেছে যে হিমানীশের কাছেই সেটা দৃষ্টিকটু লেগেছে। মনে হয়েছে যেন সকলের কাছে, গঙ্গার কাছেও ধরা পড়ে গেছে ও।

কিন্তু পরমুহূর্তেই আবার গৌরী সহজ স্বাভাবিক।

রঞ্জিৎকে বিয়ে করার পরেও হিমানীশের এই স্পর্শলোভ কমে নি এতটুকু। গৌরীর কাছেও এই তুচ্ছ ভালোলাগার রঙিন মোহটুকু বিস্বাদ লাগে নি কোনোদিন।

কিন্তু আজ জামাইবাবুর ব্যবহারে কেমন যেন ভিতরে ভিতরে একটু অপমান বোধ করলো গৌরী।

দুপুরে খাওয়া-দাওয়ার পর গৌরী এসে দাঁড়িয়েছিল বারান্দার রেলিঙে ভর দিয়ে।

হিমানীশ ও এসে দাঁড়ালো।

শুধু গঙ্গা এক ফাঁকে চিৎকার করে ডাকলো গীতাকে।—তোর জামাইবাবুকে বিছানা পেতে দিয়েছিস, গীতা ?

গৌরী শুনতে পেলো অস্ফুট জবাব দিলো—তোমার বর, তুমি দাও না। আমাদের বর এলে আমরা করে দেবো।

গৌরীও হেসে ফেললে। মেয়েটা ভারী ফাজিল হয়ে উঠেছে।

তারপর হিমানীশকে একেবারে ওর পাশে দাঁড়াতে দেখে একটু সরে দাঁড়ালো। না, কোনোকিছু না ভেবেই।

আর হিমানীশ ধীরে ধীরে বললে, চলো আমাদের ওখানে দিনকয়েক থাকবে।

—কেন ?

হিমানীশ বললে, মনটা ভালো থাকবে।

বিস্ময়ের সুর ফুটলো গৌরীর গলার স্বরে। কৌতুকের হাসি দুললো ঠোঁটের কোণে।

—আপনার কাছে ?

—কেন, আপত্তি কিসের। আমি বাঘ না ভালুক ?

—তার চেয়ে বেশী। বলে হাসলো গৌরী।

বলেই চলে এলো সেখান থেকে; এসে ঘরের মেঝেতে যেখানে মাদুর বিছিয়ে দিদি, গীতা, গায়ত্রী শুয়ে ছিল, সেখানেই শুয়ে পড়লো।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা সন্দেহ উঁকি দিলো ওর মনে। অপমানিত বোধ করলো।

জামাইবাবুর কথায় ব্যবহারে যা-কিছু দেখতে পাচ্ছে, তা নতুন নয়। তবু কেমন খারাপ লাগলো। মনে হলো, ওর এই বিচ্ছেদ, এই অসুখী মনের সুযোগ নিতে চাইছে যেন হিমানীশ।

বিকেলে বাবা ফিরে এলো, মা খাবার নিয়ে এলো বাবার আর জামাইবাবুর জন্যে। আর গল্প করতে করতে জামাইবাবু একসময় বললে, গৌরীকে দিন কয়েক আমাদের ওখানে পাঠিয়ে দিন না?

অর্থাৎ পাঠিয়ে দিলে তার মনটা সুস্থ হবে।

বাবা সায় দিলো। মাও।

দিদি বললে, সেই ভালো। চল গৌরী, দু'দিন ওখানে থেকে আসবি।

সকলেই পীড়াপীড়ি শুরু করলো। অস্বস্তি বোধ করলে গৌরী।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, না।

গঙ্গা আবার বললে, কেন, চল না দিন কয়েক থাকবি। এখানে বা তোর এমন কি রাজকাজ।

গৌরী আবার বললে, না।

তারপর একসময় বাবাকে একা পেয়ে বললে, একটা চাকরি হতে পারে কোথায় বলছিলে, দেখো না চেষ্টা করে!

দরখাস্তটা সই করতে গিয়ে একবার থমকে দাঁড়িয়েছিল। ইন্টারভিউয়ের চিঠিখানা যখন এলো, লম্বা খামখানার ওপর নাম দেখে মুহূর্তের জন্যে আবার কি যেন ভাবলো গৌরী।

কি আর ভাববে, নামটা তো নতুন নয়, সেই পুরোনো নামটাকে আবার টেনে এনেছে ফেলে-দেওয়া জঞ্জালের স্তূপ থেকে, ফুঁ দিয়ে ধুলো উড়িয়ে দিতেই সেটা নতুনের মতোই চকচক করে উঠেছে।

বাবা চেষ্টা করেছে, দরখাস্ত লিখিয়েছে দিনের পর দিন। জামাইবাবুও ব্যারাকপুর থেকে মাঝে মাঝে দু'একটা চাকরির খবর পাঠিয়ে চেষ্টা করতে বলেছে। সে-সব ক্ষেত্রে বাবার কথা মেনেই দরখাস্ত

নাম সব করতে হয়েছে। কিন্তু যার সঙ্গে সব হিসেব-নিকেশ শেষ হয়ে গেছে, কাচের ভাঙা টুকরোগুলোকে যখন জোড়া লাগানো যাবে না, নাড়াচাড়া করতে গেলে যেগুলো শুধু ক্ষতবিক্ষতই করবে, তার পদবীটা কেন আর টেনে টেনে বাড়াবে গৌরী। দড়ি ছেঁড়া একটা বাচ্চা ছাগল যেমনভাবে পায়ে বাঁধা দড়ির ফাঁসটা নিয়ে ঘুরে বেড়ায়, তেমন ভাবে গৌরী চলতে পারবে না।

তাই নিজেই খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে দেখে দরখাস্ত করতে শুরু করেছিল গৌরী, ইণ্টারভিউও পেয়েছিল কয়েকটা। তারপর চাকরি। সত্যি সত্যি একটা চাকরি পেয়ে গেল ও।

আর সেই চিঠিখানা পেয়ে একদিকে আনন্দ, আরেকদিকে অস্বস্তি। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পারবে ও, কারো কথা মেনে চলতে হবে না, কারো উপর নির্ভর করতে হবে না। মুক্তি।

একটা সামান্য চাকরি, মাসের শেষে নির্দিষ্ট একটা টাকা যে মনের মধ্যে এতখানি পরিবর্তন আনতে পারে, গৌরী জানতো না।

জীবনের যে লক্ষ্যটুকু হারিয়ে ফেলেছিল, হারিয়ে ফেলে বৃষ্টির জলে কাগজের নৌকার মতো এঁকেবেঁকে ভেসে বেড়িয়েছে, সেই লক্ষ্য কি এই চাকরি? গৌরী ওই চাকরির মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজলো। ওর মনে হলো, আর কিছুই চায় না।

কিন্তু প্রথম দিনটা বড় অস্বস্তি। তিনতলার আপিসঘরে পৌছতে গিয়ে সিঁড়ির বড় ধাপগুলো পার হতে হতে ওর পা কাঁপলো। বুকটাও।

বাবা অনেক কিছু শিখিয়ে পড়িয়ে দিয়েছিল। কি ভাবে গিয়ে দাঁড়াতে হবে, কি ভাবে কথা বলতে হবে, হাতের নিয়োগপত্রখানা দেখাবে, না শুধুই মুখে বলবে। সুইং ডোর ঠেলে 'মে আই কাম ইন স্যর' বলবে, না কি শুধুই একটা নমস্কার। নানান কথা ভাবতে ভাবতে সিঁড়ির মাঝখানেই সব ভালগোল পাকিয়ে গেল।

যে-ভয়ে ও লিফ্‌টের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে পারে নি, ওর মতো একজন সাধারণ কেরানী লিফ্‌টে উঠতে পারে কি না এই ভয়ে, ঠিক সেই কারণেই ঘরে ঢুকতেও ওর ভয় হলো।

দরজার পাশে জনকয়েক বেয়ারা টুলে বসে জটলা করছিল, গৌরী গিয়ে তাদের কাছেই প্রশ্ন করলে।

কি প্রশ্ন তা বোধহয় ভালো করে শুনলো না বেয়ারারা। শুধু গৌরী বুঝলো, ওরা সকলেই জানে, আপিসের সবাই, যে ওর মতোই একটি নতুন মেয়ে চাকরি পেয়েছে।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এত যে অস্বস্তি, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই সব দূর হয়ে গেল। বড়বাবু থেকে শুরু করে আশেপাশের সকলেই অভ্যর্থনার হাসি নিয়ে এগিয়ে এলো, প্রয়োজনে সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো, অযাচিত উপদেশ দিলো কেউ কেউ।

বড়বাবু ধীরে ধীরে বললেন, পুলিনকে ছ'আনা পয়সা দিয়ে দেবেন, একটা গেলাস কিনে আনবে।

বুঝতে না পেরে তাড়াতাড়ি ব্যাগ খুলে পয়সা বের করতে গেল গৌরী।

বড়বাবু হাসলেন, থাক্ থাক্। এখনই দিতে হবে না, যাবার সময় দেবেন।

গৌরী ততক্ষণে সপ্রতিভ হয়েছে। জিগ্যেস করলে, পুলিন কে? আর গ্লাস কি হবে?

বড়বাবু পাকা পাকা গোঁফ নেড়ে আবার হাসলেন।

বললেন, না বুঝেই পয়সা দিচ্ছিলেন?

—আপনি যে বললেন।

রিটায়ারমেন্টের সময় এসে গেছে বড়বাবুর। গোঁফ পেকে গেছে প্রায় সবগুলোই। তাই আজকাল যারা নতুন ঢুকছে কেউ ওঁকে মান্য করে না, উপদেশ শুনতে চায় না, দূরে দূরে থাকে, আর টিপ্পনী কাটে: 'বুড়ো কবে যে রিটায়ার করবে!'

গৌরী তাঁর কথার ওপর এতখানি নির্ভরতা রাখে দেখে বেশ ভালো লাগলো।

প্রথম প্রথম মেয়েরা যখন এ-আপিসে চাকরি করতে এলো ভালো লাগে নি তাঁর, অনেক কিছু যুক্তি দেখিয়েছেন এর বিরুদ্ধে, ছোট সাহেবের নামে কুৎসিত অপবাদ দিয়েছেন, কিন্তু তারপর কখন থেকে যেন নিজেকে মানিয়ে নিয়েছিলেন। বেশ ভালোই লেগেছে ওদের।

কেমন নম্র স্বভাব, যা বলেন তাই শোনে, কাজে ভুল করে বটে, কিন্তু ফাঁকি দিতে চায় না। ওদের সম্পর্কে মত বদলে যাচ্ছিল তাঁর, কিন্তু হঠাৎ দেখলেন, সব বদলে যাচ্ছে। মেয়েগুলো যেন তাদের মেয়েলী চরিত্র হারিয়ে ফেলছে। অর্থাৎ বড়বাবু ওদের যেমনটি দেখতে চেয়েছিলেন ঠিক তেমন যেন আর রইলো না। ওরাও কখন থেকে কেরানী হয়ে গেল। তেমনি উদ্ধত, অসন্তুষ্ট।

গৌরী বোধ হয় ঠিক তেমন নয়, বড়বাবুর হঠাৎ মনে হলো।

তাই বললেন, পুলিন এই বেয়ারার নাম, আর গ্লাস নিজের রাখাই ভালো বুঝলেন না। পরের গ্লাসে জল খাওয়া···

একটু আগেই একটা গেলাস কিনতে দেবার কথা বলেছিলেন, গৌরীর মুখের উচ্চারণটা শুনে এবার 'গ্লাস' বললেন।

অন্য মেয়েরাও একে একে এলো, পরিচয় নিলো। পুরুষদের মধ্যে কেউ সরাসরি এসে আলাপ করে গেল, কেউ বা এগিয়ে এলো কাউকে মধ্যস্থ রেখে।

তু'একজন বিদ্রূপের স্বরে বললে, এত জায়গা থাকতে এই কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে কেন এলেন?

তু'একজন সান্ত্বনা দিলো, আর কোথাও কিন্তু এমন মিলেমিশে কাজ করতে পেতেন না। এ আপিসে আপনার কোনো রিস্ক নেই।

অনেক কিছু শুনলো গৌরী, কখনো ওর হাসি পেলো, কখনো বিভ্রান্ত বোধ করলো।

তারপর আপিস ছুটির সময় দল বেঁধে বেরিয়ে আসতে আসতে হঠাৎ নজরে পড়লো এক প্রান্তে ফাইলে মুখ ডুবিয়ে একজন তখনও বসে আছে।

কাজ করছে এক মনে।

কি আশ্চর্য, আপিসের সকলেই তো ওর ধারেকাছে একবার না একবার এসেছে। লাজুক লাজুক দু'একজন আড়চোখে তাকিয়ে দেখেছে ওকে, আর ওর সঙ্গে কথা বলতে সাহস হয় নি বলেই হয়তো বড়বাবুর টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে বড়বাবুর সঙ্গেই কথা বলেছে।

ভালো করে মনে করবার চেষ্টা করলে গৌরী। না, ও ভদ্রলোককে এই প্রথম দেখছে ও।

কেমন একটা কৌতূহল জাগলো। সকলেই ছুটির এত আগে থেকেই পালাবার জন্যে তোড়জোড় করছিল, অথচ উনি এখনও কাজ করছেন কেন!

না, প্রশ্ন করতে পারলো না গৌরী।

একা একাই সিঁড়ি ভাঙতে শুরু করলো ও।

লিফ্‌টে ভীষণ ভিড়, তার চেয়ে···

রাস্তায় নেমে আসা পর্যন্ত তবু বড়বাবু, আরো দু'চারজন পাশে পাশে কাছে কাছে ছিল।

রাস্তায় নেমেই চতুর্দিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো সকলে। ট্রাম আর বাসে কোনোরকমে একটা পা রাখবার জন্যে ছোটাছুটি শুরু করলো।

একটা বিরাট দল বৌবাজারের দিকে হাঁটতে হাঁটতে চলেছে।

বাস-স্টপে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে গৌরীও একসময় এসপ্লানেডের দিকে হাঁটতে হাঁটতে এগিয়ে গেল।

আর হাঁটতে হাঁটতে হঠাং মনে হলো, কই, ছোটসাহেব তো একবারও ওকে ডেকে পাঠালেন না!

পর পর বেশ ক'টা দিন কেটে গেল। মনের অস্বস্তিটাও। প্রথম প্রথম একটা ভয়-ভয় ভাব ছিল, পরিচয় ছিল না অনেকের সঙ্গেই। ক্রমে ক্রমে সকলের সঙ্গেই আলাপ হলো, হলো না শুধু একজনের সঙ্গে।

আর সেজন্যেই হয়তো এত কৌতূহল গৌরীর।

একদিন বড়বাবু অর্থাৎ বৃদ্ধ অবিনাশবাবুকে তাই জিগোস করে বসলো।—আচ্ছা, বড়বাবু···

অবিনাশবাবু বাইফোকাল চশমার ওপর দিয়ে দৃষ্টি ফেললেন গৌরীর মুখের ওপর।

গৌরী লজ্জিত বোধ করলো। অনভ্যাস মুখ থেকে আরো একদিন 'বড়বাবু' সম্বোধনটা বেরিয়ে পড়েছিল। আপত্তি করেছিলেন অবিনাশবাবু।

এককালে বড়বাবু ডাকটা বেশ ভালো লাগতো, কিন্তু ইদানীং পঁচিশ তিরিশ বছরের ছেলেগুলোও পটাপট বড়বাবু হয়ে যাচ্ছে। আর মেয়েরা আসার পর থেকে তারা নিজের নামে পরিচিত হওয়াই পছন্দ করছে বলে অবিনাশবাবুও বদলে গেছেন।

অবিনাশবাবুর নায়েবী দৃষ্টি দেখে হেসে ফেললো গৌরী। তারপর ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলে, আচ্ছা, ওই যে এক কোণে ভদ্রলোক দিনরাত ফাইলে ডুবে থাকেন···

অবিনাশবাবু চোখ তুলে তার দিকে তাকালেন, তারপর বললেন, অসীমের কথা বলছেন? অসীমাভ···খুব ভালো ছেলে, কাজের ছেলে। যে কাজই দাও-না, বিরক্তি নেই মুখে।

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, তাই বুঝি খুব খাটিয়ে নেন ওঁকে?

অবিনাশবাবু হাসলেন।—খাটিয়ে নিই, না ও নিজেই খাটে কি করে বলবো বলুন।

গৌরী কি একটা বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই একজন এসে দাঁড়িয়েছে অবিনাশবাবুর টেবিলের সামনে।

অবিনাশবাবু মুখ তুললেন, কি খবর পরিতোষবাবু, খেলা দেখতে যেতে হবে বুঝি তাড়াতাড়ি?

—আজ্ঞে না। মাথা চুলকে পরিতোষবাবু বললেন, স্ত্রীকে আজ একবার ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হবে···

—আরেকটি আসছে বুঝি? হলদে পান-ছোপানো নড়বড়ে দাঁত দেখা গেল অবিনাশবাবুর হাসি হাসি মুখে।

পরিতোষবাবু লজ্জা পেলেন।—আজ্ঞে না, ওই কি সব গোলমেলে ব্যাপার, পেটে যন্ত্রণা হয় মাঝে মাঝেই।

—কোবরেজ দেখান, কোবরেজ। ওসব আজকালকার ছেলে-ছোকরা ডাক্তারদের দিয়ে কিছু হবে না।

বলতে বলতেই হঠাৎ মনে পড়ে গেল। বললেন, কিন্তু বিলগুলো সব দেখে দিয়েছেন তো? ছোটসাহেব কাল যদি না পান···

পরিতোষবাবু কিন্তু কিন্তু করে মাথা চুলকে বললে, ও ক'টা অসীমাভ বলেছে আজ করে দেবে।

—হুঁ। একটা শব্দ বের হলো অবিনাশবাবুর মুখ থেকে। বললেন, আচ্ছা।

পরিতোষবাবু চলে গেলেন খুশী মনে। আর সঙ্গে সঙ্গে অবিনাশ-বাবু গৌরীকে উদ্দেশ করে বললেন, দেখলেন তো!

—ভালোমানুষ পেয়ে সবাই বুঝি কাজ করিয়ে নেয়?

অবিনাশবাবু হেসে বললেন, তাই হয়। সব আপিসেই এই, জন কয়েক কাজের লোক থাকে, তারাই কাজ করে। আর সব বাজে ফক্কুড়ি করে আড্ডা দিয়ে বাড়ি চলে যায়।

গৌরী হাসলো। তারপর বললে, প্রোমোশনের সময় কিন্তু ওদের কথা মনে থাকে না, যারা ফাঁকি দেয় তারাই চটপট ওপরে উঠে যায়। তাই না?

অবিনাশবাবু বিস্ময়ের চোখে তাকালেন গৌরীর মুখের দিকে। তারপর কৌতুকের স্বরে বললেন, যাক, তা হলে আপিসের হাওয়া লেগেছে?

গৌরী হেসে উঠলো।

অবিনাশবাবু বললেন, যারা ফাঁকি মারে, ওসব কথা তাদের। কাজ করলে, ডিপার্টমেন্টাল পরীক্ষা দিলে উন্নতি হবে না? কার হয় নি, বলুক তো ওরা।

গৌরী কৌতুক বোধ করলে।—তবে যে বলে তোষামোদ করে প্রোমোশন পায় সব।

—তাও পায় বৈকি। পড়াশুনো না করে ফাঁকি দিয়ে অনেকে বি-এ এম-এ পাস করে না? কিন্তু যে পড়াশুনো করে, বুদ্ধিমান—সে তো ফেল করে না। এও তাই।

উপদেশ দিতে পেলে যেন আর কিছু চান না অবিনাশবাবু। তাঁরা কাজ জানতেন, আর কাজ জানা লোকের কদরও ছিল আগেকার দিনে, তাই সামান্য কেরানী থেকে বড়বাবু হতে পেরেছেন। সকলকেই তাই সে-পথে দেখতে চান।

কিন্তু গৌরীর অত তত্ত্ব কথার দিকে মন নেই। ওর কৌতূহল শুধু অসীমাভ সম্পর্কে। এমন কি আলাপ করারও ইচ্ছে হয়।

আর অসীমাভ? মনে হয়, গৌরী নামে যে একটি নতুন মেয়ে ঢুকেছে এ-আপিসে, তা যেন জানেও না সে, চোখ তুলে দেখেও নি।

এদিকে আপিসের অন্য সকলেই, কমবয়েসী ছেলেগুলোও অকারণে কাছে এসে দাঁড়ায়, অকারণ দু'চারটে কথা বলে, কেউ বা কাজ বুঝিয়ে দেবার ভান করে।

গৌরী বুঝতে পারে, ভালোও লাগে। কিংবা ভালো লাগে না, বেশ মজা লাগে! ভিতরে ভিতরে একটা কৌতুকের হাসি হাসে।

এমনিভাবেই দিনগুলো কেটে যাচ্ছিল তার। আর এইভাবেই কখন মেয়েদের দলটির সঙ্গেও ও একাত্ম হয়ে পড়ে।

পরস্পরের সঙ্গে আলাপ-পরিচয়, হাসিঠাট্টা থেকেও কিভাবে যেন দুটো পৃথক দল হয়ে গেছে দেখতে পায় গৌরী! কিংবা দুটো দলই ছিল, আর গৌরীও কখন থেকে মেয়েদের দলটায় নাম লিখিয়ে ফেলেছে।

আপিসে এসেই ওরা মেয়েরা মিলে একটা জটলা করে, আড্ডা দেয়, কে নতুন শাড়ি কিনলো, কোন মেয়ে ডুবে ডুবে জল খাচ্ছে, উমেশবাবুর চোখ পড়েছে কোন মেয়ের ওপর, সি সেকশনের বড়বাবু কি ছোটলোক···এমনি নানান আলোচনায় গৌরী নিজেও বেশ আনন্দ পেতে শুরু করে। টিফিনে তাদের সঙ্গেই দল বেঁধে যায় কাছের মাদ্রাজী দোকানটায়, চা খায়। ছুটির পর একই সঙ্গে গিয়ে বাস-স্টপে দাঁড়ায়।

আর সে সময় আপিসের দু'একটি ছেলের হাব-ভাব দেখে কৌতুক বোধ করে। বেশ বুঝতে পারে অনিমেষ ইচ্ছে করেই এদের স্টপে এসে দাঁড়ায়, আড় চোখে মাঝে মাঝে তাকায়, একই বাসে ওঠবার চেষ্টা করে।

কোনোদিন পারে, কোনোদিন পারে না।

তা নিয়ে অরুণা আর নিভার সঙ্গে হাসাহাসিও করে গৌরী।

তারপর একসময় বাসের ভিড় একটু কমে আসে, কোনোরকমে ভিড় ঠেলে উঠে পড়ে গৌরী। কোনোদিন একাই, কোনোদিন বা অরুণা আর নিভাও।

আধখানা পথ পার হয়ে কোনো কোনোদিন বসতেও পায়। এদিকে বাড়ি পৌছনোর কাছাকাছি হতেই বাস অনেকটা খালি হয়ে যায়। ঠাণ্ডা বাতাস আসে, চুল ওড়ে, মনও। মুহূর্তের জন্যে বড় একা একা মনে হয় গৌরীর।

কেমন একটা নিঃসঙ্গতা: সারাদিন হৈচৈ হুল্লোড়, কাজ—সব

কিছু মিলে মনটাকে ব্যস্ত রাখে। আর একা হয়ে পড়লেই, এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে মুখে লাগতেই মনটা সম্পূর্ণ বদলে যায়।

আর তখন কোনোদিন রঞ্জিতের কথা মনে পড়ে যায়, রাগে জ্বলে ওঠে সমস্ত শরীর, বিগত দিনের কোনো ক্ষুদ্র একটা ঘটনা কিংবা কোনো কথা মনে পড়লেই। আবার কোনোদিন বা ক্ষণিকের জন্যে উঁকি দিয়ে যায় একটি মুখ। অসীমাভ—ফাইলের স্তূপে চোখ এঁটে কাজ করছে। আর সঙ্গে সঙ্গে তার ওপরও রাগ হয় গৌরীর, অকারণ ক্রোধে জ্বলে ওঠে। বোকা, বোকা, বোকা। মনে হয় অসীমাভর মতো নির্বোধ দুনিয়ায় আর নেই। মনে হয় সকলের কাছে ঠকবার জন্যেই এসেছে সে। প্রবঞ্চিত হবার জন্যেই যেন এসেছে।

ইচ্ছে হয় এক একদিন, অসীমাভর কাছে গিয়ে দাঁড়ায়, ধমকের সুরে বলে, কেন আপনি বোকার মতো এত কাজ করেন, কেন অপরের ভার নিতে যান ?

কিন্তু সেই পর্যন্তই। সাহস হয় না।

আলাপটা যে শেষ পর্যন্ত এইভাবে হবে কোনোদিন ভাবতেও পারে নি গৌরী।

টিফিনের পর সবে নিজের চেয়ারটিতে এসে বসেছে, একটু দেরি করেই এসেছে, দেখলে অবিনাশবাবু টিফিনের কৌটো খুলে চেয়ারে বসে বসেই খাবার খাচ্ছেন। দু'চাকা আম খেলেন অবিনাশবাবু পরম তৃপ্তিতে, প্রায় ছোট ছেলেদের মতো, একটুকরো পাঁউরুটি খেলেন, তারপর মুখ হাত ধুয়ে এসে বসলেন পুলিনকে চা আনতে বলে।

টিফিনের সময় সকলেই বেরিয়ে যায়, শুধু অবিনাশবাবু একা বসে থাকেন তখন।

কিন্তু সেদিন অবিনাশবাবু ফিরে আসতেই ওদিকের কোণ থেকে অসীমাভ ছুটে এলো। বেশ বোঝা গেল রেগে গেছে সে।

অবিনাশবাবুর সামনে এসে কাগজপত্র টেবিলের ওপর ফেলে দিয়ে অসীমাভ বললে, এ-সব আমার দ্বারা হবে না, পারেন তো আপনি করুন।

—কি হলো? কৌতুকের চোখে তাকালেন অবিনাশবাবু।

অসীমাভর রাগটা নতুন নয় তাঁর কাছে। বুঝলেন কিছু একটা গোলমাল হয়েছে কোথাও।

অসীমাভ রাগের স্বরেই বললে, সব ভুল, সব ভুল হয়েছে। এ হিসেব ঠিক করতে হলে সব নতুন করে করতে হবে।

অবিনাশবাবু হাসলেন।—তা তুমিই একটু ঠিক করে নাও না অসীম।

অসীমাভ এক মুহূর্ত চুপ করে রইলো, তারপর বললে, তার চেয়ে উমেশ পুলিন ওইসব বেয়ারাদের এ-কাজ দিন। ওরা অনেক ভালো যোগবিয়োগ জানে।

অবিনাশবাবু হাসলেন। তারপর কাগজের ওপর চোখ বুলিয়েই বললেন, বসো।

অসীমাভ বসলো।

—এই মেয়েটিকে চেনো? গৌরীর দিকে ইঙ্গিত করলেন অবিনাশবাবু। বললেন, নতুন এসেছে, প্রথম প্রথম একটু ভুল হবে না? তোমরা যদি···

অসীমাভ গৌরীর দিকে ফিরে তাকালো, চোখোচোখি হলো, আর সঙ্গে সঙ্গে অপ্রতিভ বোধ করলো ও।

গৌরী ততক্ষণে লজ্জায় ভয়ে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসেছে।—ভুল হয়েছে?

অবিনাশবাবু হাসলেন।—ভুল মানে, সব ভুল। অত করে বুঝিয়ে দিলাম সেদিন···

লজ্জায় অপমানে তখন থরথর করে কাঁপছে গৌরী।

অসীমাভ আরেকবার তাকালো গৌরীর মুখের দিকে, তারপর

কাগজ-পত্র তুলে নিয়ে বললে, না, না, এমন কিছু না, ও আমি ঠিক করে নেব। বলে উঠে চলে গেল নিজের চেয়ারে। যেন অসীমাভ নিজেই লজ্জা পেয়েছে, গৌরী নয়। যার বিরুদ্ধে অভিযোগ তারই সামনে পড়ে গিয়ে অপ্রতিভ বোধ করছে।

আর গৌরীর মুখখানা এদিকে সাদা হয়ে গেছে। চোখ ঠেলে এখনই বুঝি জল এসে পড়বে।

মনটা ভালো ছিল না গৌরীর। যখন বাড়ি ফিরলো তখনো বুকের ওপর যেন একটা ভারী পাথর চেপে আছে।

সন্ধ্যে হয়ে গেছে তখন। বাড়ি ফিরতে ফিরতে প্রতিদিনই সন্ধ্যে হয়ে যায়। গলি রাস্তাটায় কোনোদিন আলো জ্বলে, কোনোদিন জ্বলে না। বাসের ভিড় থেকে নেমে একটু ফাঁকা হাওয়ার আমেজ পেয়ে মনের বিক্ষুব্ধ ভাবটা ঝিমিয়ে পড়েছে তখন। একটা গুমোট আবহাওয়ার মধ্যে হঠাৎ এক দমকা ঠাণ্ডা হাওয়া এসে পড়লে যেমন লাগে। কিংবা অন্ধ গলির ছোট জানালার ঘরে কোনো কোনোদিন একটা বাতাসের রেশ ধাক্কা খেতে খেতে অনেক আঁকাবাঁকা রাস্তা পার হয়ে, দেয়ালে দেয়ালে ঘা খেয়ে খেয়ে হঠাৎ এক সময় জানালার ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়লে যেমন সমস্ত মনটাকে দুলিয়ে দিয়ে যায়!

বাস থেকে নেমে সারি সারি ঝকঝকে আলোয় সাজানো দোকানের শো-কেসগুলোর দিকে এক চোখ তাকিয়ে দেখলো গৌরী। আশপাশের সাজানো পুতুলের মতো মেয়েদের ভিড়ের দিকে। তারপর এক জোড়া অল্পবয়সী স্বামী-স্ত্রীর দিকে। বেশ হেলেদুলে গল্প করতে করতে চলেছিল ওরা, ফুটপাথের ফুলের দোকানীর সামনে দাঁড়ালো।

বেলকুঁড়ির মালা একটা তুলে নিলো মেয়েটি, দর করতে গেল। ছেলেটি হাসলো, দর না করেই দাম দিয়ে দিলে।

মেয়েটি খুব খুশী হলো, হেসে উঠলো। তারপর তু'জনেই ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে গেল।

গৌরী যখন গলির মোড়ে এসে পৌঁছেছে তখনও ওই ছেলেটি আর মেয়েটির ছবি ওর মনের মধ্যে রিমরিম করছে।

গলির আলোগুলো বেশ জ্বলছিল, দপ্ করে নিভে যেতেই মনের রেশটাও কেটে গেল।

বাড়ি ফিরে দেখলে বাবা তখনো ফেরে নি। কোনো কোনোদিন ফিরতে তাঁর বেশ দেরিই হয়।

জামাকাপড় বদলে গা ধুয়ে এসে মনটা আরো হাল্কা হলো। এসে শ্যামলের টেবিলের পাশে বসলো চেয়ার টেনে নিয়ে!

—হ্যাঁ রে, আমি যদি এম-এ পড়ি প্রাইভেটে?

পুরু লেন্সের ভেতর থেকে শ্যামলের চোখ জোড়া উৎসাহে বড়ো হলো।—খুব ভালো, সত্যি মেজদি, তুমি তাই পড়ো! আমি তোমাকে সব বই যোগাড় করে এনে দেব!

গৌরী হাসলো।—দূর, এমনি বলছিলাম।

শ্যামলের উৎসাহ যেন নিভে গেল হঠাৎ।

গীতা আর গায়ত্রী ততক্ষণে এসে দাঁড়িয়েছে কাছে।

—মেজদির সঙ্গে এত কি কথা হচ্ছে শুনি, ফিসফিস করে? গীতা প্রশ্ন করলে সকৌতুকে।

—ও আমাদের প্রাইভেট টক। বলে শ্যামল তার রোগা চেহারার কাঁধ কাঁপিয়ে শ্রাগ করলে।

আর গায়ত্রী বললে, জানি জানি, মেজদি মাইনে পেলে কিছু বাগাবার তাল, তাই না মেজদি?

মেজদি হাসলে।—শ্যামল কি তোদের মতো, শুধু শাড়ি আর সিনেমা?

—ওর যে তেমনি বই আর ম্যাগাজিন? কম টাকা ওড়ায় নাকি ওইসব করে।

গায়ত্রী বাধা দিলো—সে ও কি চায় না-চায় জানি না, আমাকে কিন্তু একটা শাড়ি দিতে হবে মেজদি।

গৌরী আঁৎকে উঠলো।—কি বলছিস গায়েত্তির। কত মাইনে পাবো ?

গীতা বললে, তোমার তো কোনো খরচ নেই মশাই।

গৌরী শুনলো কথাটা। চুপ করে রইলো। কি আশ্চর্য, ওরা তাকে এত স্বার্থপর ভেবে বসে আছে ? ভেবেছে মাইনের টাকা ক'টা নিয়ে ও নিজে ফূর্তি করে ওড়াবে ? অথচ, চাকরি পাওয়ার পর থেকে গৌরী বেশ লক্ষ্য করেছে, ওর সঙ্গে সম্পর্কটা সকলেরই কেমন যেন নিবিড় হয়ে গেছে ইদানীং।

ভাইবোনরা সকলেই একটু বেশী বেশী ভালো ব্যবহার করতে শুরু করেছে। একটা মুহূর্তও এখন আর ওকে আগের মতো একা একা বসে থাকতে হয় না। কেউ না কেউ কাছে এসে বসে, গল্প করে, হাসে, হাসায়।

এক একদিন গৌরীর অবশ্য মনে হয়েছে এ-সবই ওর মনের ভুল। যেমন ছিল তেমনই আছে। নিজের পায়ে দাঁড়াতে পেরেছে বলেই ওর মনেও হয়তো একটু গর্ব উঁকি দিতে শুরু করেছে। তাই মনে হয়েছে ওকে সবাই মূল্য দিতে চাইছে। কিংবা ওর রোজগারে সংসারের সুরাহা হবে মনে করে।

উঁহু, তা নয়। আগে আপিসের সময়ে বাবার জন্যে যত তাড়াহুড়ো ছিল, মা যত ব্যস্ত হতো, এখন গৌরীর জন্যেও ততখানি। সে কি শুধু মাসের মাইনেটা পাবে বলে ?

একটু যে সন্দেহ না হতো এমন নয়।

আপিসে বেরুনোর আগে মা তাড়াতাড়ি রান্না করতে করতে ওকে খেতে বসিয়ে দেয়। কাছে বসে একটুক্ষণ। এক টুকরো মাছ বেশী দেয়।

প্রথম প্রথম বড় লজ্জা করতো গৌরীর। এখন আর করে না।

কিন্তু ও মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল মাসের মাইনেটা হাতে পেয়ে মা'র হাতে তুলে দেবে। সকলে যাতে বোঝে ওর দায়িত্ব ও নিজেই নিয়েছে।

তাই গীতার কথায় ও মনে মনে ক্ষুণ্ণ হলো।

গীতা হাসতে হাসতে বললে, তোমার তো কোনো খরচ নেই মশাই।

গৌরী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো, তারপর ধীরে ধীরে বললে, ও টাকা আমি মা'কে দেবো।

—মাকে? চোখ কপালে তুললো গীতা আর গায়ত্রী।

—খবর্দার, খবর্দার, ও কাজও ক'রো না মেজ্দা।

গৌরী হেসে ফেললো।—কেন?

—সংসার মানে ম্যানহোল। যতই জল ঢাল সব গড়িয়ে চলে যাবে।

—ওরে বাব্বা। শ্যামল হেসে উঠলো।—খুব ফিলসফি শিখেছো দেখছি।

গৌরী হেসে উঠে বললে, কে শেখাচ্ছে রে? বলেই গীতার মুখের দিকে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকালো।

গীতা লজ্জা পেল।—দূর্।

গৌরী আরো কি যেন বলতে যাচ্ছিল, তার আগেই সিঁড়ি থেকে জুতোর শব্দ এলো, বোধহয় আরতি ফিরছে পাড়া বেড়িয়ে আড্ডা দিয়ে। লাফিয়ে লাফিয়ে দুটো করে সিঁড়ি পার হ'য়ে ছুটতে ছুটতে আসছে আরতি, শব্দ শুনলেই বোঝা যায়।

হ্যাঁ, আরতি।

আরতি হাঁপাতে হাঁপাতে এসেই সকলের মুখের ওপর দিয়ে চোখদুটো বুলিয়ে নিয়ে গিয়ে বললে, ইস্! পরচর্চা ক্লাব শুরু হয়েছে বুঝি? মিস্ করে গেলাম তো!

গৌরী ধমক দিলো।—আরু!

আরতি গম্ভীর হয়ে গেল। তারপর বললে, মাইরী মেজদি, তুমি আছো খেয়াল করি নি।

গৌরী হেসে উঠলো।—আমি না থাকলেই বুঝি পরচর্চা হয় ওদের ?

আরতি ঘাবড়ে গেল।—না, না, তোমাকে নিয়ে নয়। সত্যি না।

বোকা আর ফাজিল মেয়েটার কাণ্ড দেখে গীতা আর গায়ত্রী অস্বস্তি বোধ করলো।

আর আরতি বললে, মেজদি, শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।

বলে বারান্দায় ওকে ডেকে নিয়ে গেল।

শ্যামল পিছন থেকে বললে, না, ওসব কানের দুলটুল হবে না, মেজদি বলে দিয়েছে।

কিন্তু কথাটায় ওরা দু'জনে কেউই কান দিলো না।

বারান্দার একপাশে এসে আরতি চাপা গলায় বললে, কাকে দেখলাম জানো বড় রাস্তার মোড়ে ?

—কাকে ?

—মেজজাঁইবাবু। রঞ্জিৎদাকে।

অর্থাৎ রঞ্জিৎ।

গৌরীর সমস্ত মুখখানা মুহূর্তে কঠিন হয়ে উঠলো।

ক্রুদ্ধ স্বর শোনা গেল, বললে কিছু !

সজোরে মাথা নাড়লো আরতি।—না, না। সপাং সপাং করে বেণী দুটো এসে লাগালো গৌরীর গায়ে, চাবুকের মতো।

আরতি আবার ধীরে ধীরে বললে, আমার সঙ্গে চোখোচোখি হতেই ছুটে পালিয়ে এলাম।

প্রথম প্রথম আপিস যাওয়ার সময় কেমন একটা জড়তা যেন গৌরীকে গ্রাস করে থাকতো। সে-সব দিনের কথা ভাবলে ওর নিজেরই হাসি পায়।

গীতা একদিন ঠাট্টা করে বলেছিল, আপিসে তোকে সবাই কি বলে ডাকে রে? গৌরীবাবু?

শুনে সবাই হেসে লুটিয়ে পড়েছিল।

আপিসের সিঁড়ি ভেঙে সবে নিজেদের ঘরটার সামনে এসে পৌঁছেছে, টুল থেকে পুলিন উঠে দাঁড়িয়েছে ওর পিছনে ছোটসাহেবকে দেখতে পেয়ে, সঙ্গে সঙ্গে গৌরীর মনে পড়ে গেছে সেই প্রথম দিন কত অস্বস্তি বোধ করেছিল এই বেয়ারাকে ডাকতে গিয়ে।

বেয়ারা-পিওনদের তখনও চিনে উঠতে পারে নি। অবিনাশবাবু পুলিনকে নাম ধরে ডেকেছিলেন, তবু গৌরী অস্বস্তি বোধ করেছিল, ভেবে পায় নি ওকে 'পুলিন' বলে ডাকাই সঙ্গত হবে কি না।

আজ পুলিনকে উঠে দাঁড়াতে দেখেই পিছন ফিরে দেখলে, তারপর সরে দাঁড়িয়ে পথ ছেড়ে দিলো।

হাতের সরু লম্বা ভ্যানিটি ব্যাগটা ত্বু'বার নিজের হাঁটুতে ঠুকে গৌরী পুলিনকে ডাকলে ছোটসাহেব চলে যেতেই।

তারপর ধীরে ধীরে নিজের টেবিলে এসে দাঁড়ালো।

জনকয়েক মাত্র এসে পৌঁছেছে তখন।

টেবিল চেয়ারে ধুলো। চারপাশের দেয়ালে স্তূপীকৃত ফাইলের জমাট ধুলো এখন সহ্য হয়ে গেছে। কিংবা নিজেরাও ভিতরে ভিতরে সকলে অমনি জীর্ণ বিবর্ণ হয়ে গেছে বলেই হয়তো কেউ মাথা ঘামায় না। প্রথম প্রথম কয়েকদিন খারাপ লাগে, তারপর ওগুলোর দিকে তাকিয়ে কাজের সব উৎসাহ চলে যায়। মান্ধাতা আমলের নোংরা

চেয়ার টেবিল আর রাশিকৃত রঙচটা ফাইলের সংস্পর্শে এসে সব উদ্দীপনা চলে যায়।

কিন্তু চেয়ার টেবিলের ধুলোটে চেহারা কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারে না গৌরী। কেউ কেউ নিজেরাই সাফ করে নেয়। কেউ কেউ বেয়ারাদের ডাক দেয়।

গৌরীও তাই পুলিনকে ডাক দিলো।

প্রথমবার সাড়াই দিলো না পুলিন।

আবার ডাক দিতে তবে অনিচ্ছাসত্ত্বে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে এসে ঝাড়নটা কোনোরকমে হু'বার টেবিলের ওপর বুলিয়ে দিলো।

গৌরী মনে মনে চটছিল, মনে মনে প্রতিদিনই চটে।

তারপর ঝাড়নটা হাত থেকে কেড়ে নিয়ে নিজেই মুছে নেয়।

কেরানী আর বড়বাবুদের ওপরই যত আক্রোশ এদের। গৌরী বেশ বুঝতে পারে।

অথচ ছোটসাহেব বড়সাহেবদের দেখলেই কেমন হকচকিয়ে উঠে দাঁড়ায়, সেলাম করে, কিছু একটা মুখ থেকে খসতে না খসতে হুকুম তামিল করে।

সকলের সামনে তাই কোনো কোনোদিন হাস্যাস্পদ হতে হয়, নিজেকে বড় হেয় মনে হয়। আরো খারাপ লাগে লিফ্‌টম্যানের ব্যবহার।

তাই যেদিন পারে, সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে উঠে আসে। আজও এসেছিল, কিন্তু পুলিন, যে প্রথম প্রথম এত বিনয় দেখাতো, না চাইতেও জল এনে দিতো, সেও আজকাল তাচ্ছিল্য দেখায় কেন?

তবে কি গৌরীও এখন আর সকলের মতোই হয়ে গেছে!

কিছুক্ষণের মধ্যেই এদিকে আপিস গমগম করে উঠলো। একে একে সকলেই এসে পৌঁছচ্ছে। হৈচৈ হট্টগোল, খবরের কাগজের খবর নিয়ে চর্বিতচর্বণ।

অবিনাশবাবুও একসময় এসে বসলেন, চেয়ার টেবিলে একটা ফাইল ঠুকে ধুলো উড়িয়ে দিয়ে।

গৌরী একদিন বলেছিল, কাপড় নোংরা হবে, মুছে নিন ভালো করে।

অভিযোগের স্বরে বললে, অর্থাৎ উপদেশ নয়, পুলিনের বিরুদ্ধে অভিযোগ।

অবিনাশবাবু হেসেছিলেন নিজের নোংরা ধুতি আর ঘামে ভেজা পাঞ্জাবির দিকে তাকিয়ে। বলেছিলেন, ধুলোয় জন্ম, ধুলোতেই মিশে যেতে হবে আর ক'দিন পর। মাঝখানে শুধু কাগজ কলম আর কাগজের নোট খানকয়েক, তার জন্যে এত ভেবেচিন্তে কি হবে?

গৌরী এ-কথায় না হেসে পারলো না।

এদিকে অবিনাশবাবুর কথা শুনে শশাঙ্ক এগিয়ে এলো।—কি হলো অবিনাশদা, এত তত্ত্বকথা হঠাৎ?

শশাঙ্ককে বেশ ভালো লাগে গৌরীর। চমৎকার আমুদে মানুষ. কথায় কথায় হাসির ছটা। বয়স বেশী নয়, কিন্তু এর মধ্যেই আধখানা মাথা টাক, সামনের দিকে চুল নেই এক গাছা।

দুপুরে টিফিনের সময় আপিস থেকে দু'পা দূরেই যে মাদ্রাজী কফির দোকান, সেখানে দলবেঁধে আলুভাজি আর মসাল্লা দোসা খেতে গিয়ে মাঝে মাঝে দু'একটা ছিটেফোঁটা খবরও কানে আসে। কেরানী আর কেরানিনীদের নাম জড়িয়ে নির্দোষ রসিকতা কিছু। কখনো বা কোনো ছোটসাহেবের দৃষ্টি পড়েছে কোনো মেয়ের উপর।

গৌরীও যোগ দিতে শুরু করেছে ইদানীং সে রসিকতায়।

তাই বললে, মন্দিরা আসে নি কেন আজ?

যেন শশাঙ্করই জানবার কথা।

শশাঙ্ক সে-কথার উত্তর না দিয়ে বললে, সেজন্যেই তো আপনাকে দেখতে পেলাম। পূর্ণিমা থাকলে কি আর লণ্ঠনের দিকে চোখ পড়ে।

ঠাট্টাটা গা সওয়া হয়ে গেছে গৌরীর। ও জানে শশাঙ্কর কথা বলার রীতিটাই এমনিই। তাছাড়া, কথাটা এতই মিথ্যে যে শুনে হেসে উড়িয়ে দিতে হয়। খুব সাদাসিধে চেহারা মন্দিরার, তামাটে গায়ের রঙ, একটু বা শীর্ণ, রুগ্ন।

তার পাশে গৌরী? কোনো তুলনাই হতে পারে না।

শশাঙ্ক বললে, মন্দিরা হলো হীরে।

—হীরে? অতিশয়োক্তিতে হেসে উঠলো গৌরী।

আর শশাঙ্ক গম্ভীরভাবে বললে, হাসছেন যে! মাটি খুঁড়লেই কি হীরে পাওয়া যায়? দিনের পর দিন চেষ্টা করে তবে হঠাৎ আবিষ্কার করা যায়।

—মন্দিরাকেও সেইভাবে আবিষ্কার করেছেন?

—নিশ্চয়। এই আপিসে সাত বছর চাকরি করছে মন্দিরা, এতদিনে চোখে পড়লো।

হেসে উঠলো গৌরী, শশাঙ্কর কথায়। ও শুনেছে, তিন মাস অন্তর এক একটি নতুন হীরে আবিষ্কার করাই রীতি তার। বেশ কয়েকদিন তারই নাম জপ করে কাটিয়ে দেয় সে, তারপর আবার একজন···

গৌরীও তাই ঠাট্টা করে বললে, একটার পর একটা আবিষ্কার করতে করতে তো টাক পড়ে গেল, মন্দিরার মাথায় অত সুন্দর চুল, ও কি টাক পছন্দ করবে?

শশাঙ্ক মুখ কাচুমাচু করলে।—কি করবো বলুন, মাথায় যা থাকলে ঘাস গজায়, তা যে নেই আমার।

বুঝতে না পেরে বিস্ময়ের চোখে তাকালে গৌরী।

আর শশাঙ্ক বললে, গোবর! গোবর না থাকলে ঘাস যে গজায় না।

কথাটা আরো অনেকের কানে গেল, আর হোহো করে হেসে উঠলো সকলে।

হাসি থামতেই শশাঙ্ক বলে বসলো, তবে আপনিও সাবধান থাকবেন, আপনাকেও বোধহয় কেউ আবিষ্কার করে বসেছে।

—কে? কে? কৌতূহলের স্মিত হাসি দেখা দিলো গৌরীর চোখে।

শশাঙ্ক বললে, অসীমাভ, যে এবার কেরানীপণ্ডিত উপাধি পাবে গরমেণ্ট থেকে।

—মানে? হঠাৎ যেন চমকে উঠলো গৌরী। একটু অস্বস্তি।

—বাঃ, কৃষিপণ্ডিত আছে, কেরানীপণ্ডিত থাকবে না? তাই দিনরাত কাজ করে করে কেরানীপণ্ডিত হবে অসীমাভ। শশাঙ্ক বললে।

গৌরী চুপ করে রইলো। কথা যোগালো না মুখে।

শশাঙ্ক লক্ষ্য করলো না। শুধু বললে, আপনার হাতের লেখার যা প্রশংসা করছিলো!

—হাতের লেখার! আমার?

মনটা ভিতরে ভিতরে একটু খুশী হয়ে উঠলো। সেদিন অপমানিত হওয়ার পর থেকে কেমন একটা বিরুদ্ধ ভাব জেগেছিল অসীমাভ সম্বন্ধে, সামান্য একটা প্রশংসার কথা শুনে সব আক্রোশ ধুয়ে মুছে গেল।

ইচ্ছে হলো, একবার কোনো অজুহাতে, কোনো ছুতোয় গিয়ে দুটো কথা, একটু আলাপ করে আসে গৌরী। পারলো না।

তবু মনের মধ্যে রেশটা রয়ে গেল।

সেদিনই বিকেলে ছুটির পর লিফ্‌টের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গৌরী। লিফ্‌টম্যানের বিরুদ্ধে একটা অভিযোগের জবাব হিসেবেই যেন।

পুলিন এবং অন্যান্য বেয়ারাদের মতোই এই লিফ্‌টম্যানটার ব্যবহারও পছন্দ হয় না গৌরীর। যেন সাধারণ কেরানী, নিচু আসনের লোকগুলোকে দাঁড় করিয়ে রেখে, কিংবা যে-কোনো প্রকারে

তাচ্ছিল্য করে পরম আনন্দ পায় লোকটা। অথচ কোটপ্যান্ট পরা কোনো বিলীতি সাহেব দেখলে, অথবা আপিসের দিশী সাহেবদের বেলায় লোকটা সেলাম ঠুকেই আছে।

বকশিশ? না তাও নয়। এ এক বিচিত্র স্বভাব, এর কোনো হদিসই পায় না গৌরী।

তাই সিঁড়ি ভেঙেই ওপরে উঠতো গৌরী, সিঁড়ি ভেঙে নিচে নামতো, তবু সেদিন ইচ্ছে করেই গিয়ে দাঁড়ালো লিফ্‌টের সামনে।

আর লিফ্‌টের জন্যে অপেক্ষা করতে করতে হঠাৎ শুনলে পিছন থেকে কে বলে উঠলো, শুনুন।

চমকে ফিরে তাকালো গৌরী।

অসীমাভ মুখ কাচুমাচু করে বললে, সেদিন না জেনে অনেক কিছু বলে ফেলেছি, রাগ করেছেন নিশ্চয়!

গৌরী হাসলো।—রাগ করবারই তো কথা।

অসীমাভ আরো অপ্রতিভ বোধ করলে। বললে, মাফ করবেন, না জেনে, মানে, হঠাৎ এক একসময় এত রেগে যাই।

—লীভার খারাপ বুঝি!

ততক্ষণে লিফ্‌ট এসে দাঁড়িয়েছে। আর আশ্চর্য, সব লোক তখন নেমে গেছে, কেউ বা সিঁড়ি ভেঙে, কেউ বা লিফ্‌টে।

গৌরী আর অসীমাভ পরস্পরের মুখ চাওয়াচাওয়ি করলো। তারপর দু'জনেই লিফ্‌টের মধ্যে ঢুকলো।

দু'জনেই নির্বাক। কারও মুখে কোনো কথা নেই। গৌরীর বুকের মধ্যে মুহূর্তের জন্যে বুঝি হৃদ্‌স্পন্দন থেমে গেল। এক চিলতে আতঙ্ক। যদি শশাঙ্ক দেখতে পায়, কিংবা অন্য কেউ!

তারপর অসহ্য নীরবতাটুকু ভাঙবার জন্যেই বললে, আপনাকে সকলে এত খাটিয়ে নেয় কেন বলুন তো?

গীতাকে কিছুদিন ধরেই লক্ষ্য করছে গৌরী। আগেও লক্ষ্য করতো, আর মনে মনে কৌতুকের হাসি হাসতো। এমন ভাব দেখাতো যেন কিছুই বোঝে না ও, কিছুই জানে না। আবার কখনো কখনো ইচ্ছে হতো ডেকে জিগ্যেস করে, হাসিঠাট্টার মধ্যে দিয়ে ওর আনন্দের ভাগ নেয়, কিংবা অযাচিত ছুটো উপদেশ দেয়।

ইদানীং, রঞ্জিতের সঙ্গে এমন একটা ব্যাপার ঘটে যাওয়ার পর থেকে মন বদলে গেছে গৌরীর। ইচ্ছে হয় গীতাকে একবার সাবধান করে দিতে।

পারে না, কেমন একটা আড়ষ্টতা কিংবা ভয়, যদি রূঢ় একটা জবাব দিয়ে বসে গীতা!

সেদিন অকারণেই মনের মধ্যে কেমন একটা ফূর্তি পাখা মেলেছিল। রবিবার, ছুটির দিন। কোনো কাজ নেই, অফুরন্ত বিশ্রাম। কিন্তু সেজন্যে নয়, বোধহয় আগের দিনের একটুকরো মুগ্ধতার রেশ তখনও লেগে ছিল ওর শরীরে, বাতাসে ওড়া রেশমী শাড়ির মতো হাল্কাভাবে ছুঁয়ে ছিল ওর মন।

অসীমাভর সঙ্গে মাত্র একটি মিনিট, কি তারও কম সময়, আপিসের লিফ্‌টে একসঙ্গে ছিল, একসঙ্গে নেমেছে, কই সারাক্ষণ কোনো কথা হয় নি ছু'জনে। লিফ্‌টম্যান ছিল বলেই আরো ঘনিষ্ঠ মনে হয়েছে, অস্বস্তি লাগে নি, অপ্রতিভ বোধ করে নি।

নির্জনতাই কি মানুষকে কাছাকাছি এনে দেয়? মনে মনে দৃশ্যটা রোমন্থন করতে করতে গৌরী একসময় নিজের মনেই হেসে ফেলে। অসীমাভ এত লাজুক কেন, এমন জড়োসড়ো ভাব কেন। কিন্তু গৌরী বেশ বুঝতে পারে লিফ্‌টম্যান না থাকলে ও নিজেও হতো

অস্বস্তি বোধ করতো, আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়াতো, কথা বলতো। লিফ্টম্যান ছিল বলেই স্বচ্ছন্দ বোধ করেছে।

গৌরী ভেবেছিল অসীমাভ আরো কিছু বলবে। বলে নি। লিফ্টের মধ্যে যতক্ষণ ছিল—এক মিনিট, তবু দীর্ঘ সময় মনে হয়েছে। এ-সময়ের মধ্যে কত কি তো বলতে পারতো।

লিফ্ট থেকে বেরিয়ে এসে একটু অপ্রতিভভাবেই শুধু একটা কথা বলেছিল অসীমাভ। ছোট্ট একটুকরো কথা।—চলি!

বলেই মৃদু হেসে অন্য পথ ধরেছিল। গৌরীর মনে হয়েছিল, ওর কাছ থেকে পরিত্রাণ পেয়ে যেন বাঁচলো ভদ্রলোক।

সে-সব কথা মনে পড়তেই নিজের মনেই হেসে ফেললো গৌরী।

বালিশে মাথা গুঁজে এতক্ষণ পড়ে ছিল, জানালা দিয়ে একফালি রোদ এসে পড়েছে দেখেও। প্রতিদিনই তো ভোর থেকে উঠে আপিসের জন্যে তৈরি হতে হয়। আধঘন্টা আগে গিয়ে বাস-স্টপে দাঁড়ালেও কোনো কোনোদিন বাসে উঠতে পারে না ভিড় ঠেলে।

কিন্তু ছুটির দিনে এ-সব ঝামেলা নেই। আসল ছুটি তো এইটুকুই। আসা-যাওয়ার পথের ভিড় ঠেলতে হয় না, দম বন্ধ করে ভিড়ের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে হয় না।

আরো একটু শুয়ে গড়িয়ে সময় কাটানোর ইচ্ছে ছিল, কিন্তু কে কখন পাখাটা বন্ধ করে দিয়েছে। তাই উঠে পড়তে ইচ্ছে হলো।

কলঘর বন্ধ। এই এক বিরক্তি প্রতিদিন সকালে। ঘুম থেকে উঠে মুখচোখে জল দেবারও উপায় নেই। নিচের তলাটা ভাড়া দিয়ে দেবার পর থেকে অসুবিধে বেড়েছে।

বেশ কিছুক্ষণ পরে তবে কলঘর থেকে অঞ্জু বেরিয়ে এলো স্নান সেরে। সকালে স্নান করা ওর অভ্যাস। অভ্যাস নয়, এত সকালে স্নান করলে বেশ আরামে বালতি বালতি জল ঢালতে পায়। যত বেলা হবে জল ততই টান পড়বে।

মুখচোখ ধুয়ে টুথব্রাশে পেস্ট নিয়ে ধীরে ধীরে নিঃশব্দ পায়ে গীতার পড়ার টেবিলের পেছনে এসে দাঁড়ালো গৌরী।

কি পড়ায় মন! রবিবারেও ছুটি নেই, ভোর থেকেই এসে বসেছে পড়ার টেবিলে।

একদৃষ্টে তার দিকে তাকিয়ে রইলো গৌরী। গীতা টের পায় নি। বই খুলে রেখে ও টেবিলের পাশের জানালা দিয়ে কোনাকুনি ও-বাড়ির জানালার দিকে ঠায় তাকিয়ে আছে।

রাস্তার ওপারে রমণীবাবুদের বাড়ির দিকে। হ্যাঁ, জানালার ধারে রমণীবাবুর ছোট ছেলেটাও বই নিয়ে বসে আছে। এম-এ পরীক্ষা দেবে এবার।

গৌরীকে দেখতে পেয়েই বিমলেন্দু, বিমলেন্দুই তো নাম, চট্ করে মুখ ঘুরিয়ে নিলো। আর সঙ্গে সঙ্গে পিছন ফিরে তাকালো গীতা।

গৌরীর সঙ্গে চোখোচোখি হতেই গীতার সারা মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। অপ্রতিভ মুখখানা পরমুহূর্তেই ফিরে গেল সামনে খুলে রাখা বইটার দিকে। বইয়ের পাতায় চোখ এঁটে গুনগুন করে পড়তে শুরু করলো।

গৌরী হেসে ফেলেছিল। অন্যদিন হলে হয়তো একটা মৃদু ধমক দিতো. হয়তো দুটো সাবধানবাণী উচ্চারণ করতো।

কিন্তু মনটা বেশ হাল্কা আর নরম হয়ে গেছে অসীমাভর সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকে। গীতা ওর মতোই ভুল করে বসবে, ভালোবাসবে, একথা ভাবছে কেন গৌরী। নেহাত একটা কৌতুকও তো হতে পারে। একটা অর্থহীন ছেলেমানুষি হয়তো।

গৌরী নিজেও তো সেটুকুই উপভোগ করছে। অসীমাভ সম্পর্কে ওর মনে তো কোনো দাগ নেই, কোনো ছায়া নেই। একবার যে-ভুল করেছে, সে-ভুল আর কোনোদিনই করবে না ও। সে বিশ্বাস ওর নিজের ওপর আছে।

তবু একটা নির্দোষ কৌতূহল থাকবে না কেন ! একটু দুষ্টুমির অভিনয় করতে দোষ কি।

গৌরী তাই আড়ালটা সরিয়ে দিতে চাইলো। সটান এসে গীতার পড়ার টেবিলের এক কোনায় উঠে বসলো, ডান পা-টা লম্বা করে রাখলে গীতার চেয়ারে।

গীতা তখনো মুখ তুলছে না বই থেকে।

গৌরী ধীরে ধীরে হাত বাড়িয়ে বইখানা কেড়ে নিলো। সেটা বন্ধ করে রেখে দিলো একপাশে।

গীতা কি ভয়ে কাঁপছে থরথর করে ? না, লজ্জায় মুখ তুলতে পারছে না ?

—খুব পড়া হচ্ছে তো !

বলেই হেসে উঠলো গৌরী। বললে, শুধু দৃষ্টি বিনিময়, না মন বিনিময়ও হয়ে গেছে ?

ভয় কিংবা লজ্জা সরে গেল ধীরে ধীরে।

তবু অভিনয় ছাড়তে রাজি নয় গীতা। বিস্ময়ের ভান করে বললে, সে আবার কি ! কার কথা···

গৌরী হেসে উঠলো আবার।—তাই বলি পড়ায় মন কেন এত, সকাল-সন্ধ্যে বই নিয়ে বসে থাকতে দেখে আমি ভাবছিলাম শ্যামলের মতো পড়ুয়া হয়ে উঠেছিস বুঝি।

গীতা তখনো চুপ করে আছে।

—বিমলেন্দুর সঙ্গে দেখাটেখাও হয়, তাই না ?

চমকে চোখ তুলে তাকালো এবার গীতা।—ধ্যাৎ।

—সব কথা স্পষ্ট করে বল আমাকে, তা না হলে···

গীতা হাসলো।—বয়ে গেছে আমার ওর দিকে তাকাতে। ও তাকিয়ে থাকে বলেই তো চেয়ারটা সরিয়ে নিয়েছি।

গৌরী হাসলো।—যাক্ বাবা, বলবি না যখন, তখন আর ডিস্টার্ব করে লাভ নেই।

বলে উঠে যাচ্ছিল গৌরী। খপ করে তার হাতখানা ধরলো গীতা।—মাকে বলে দিবি না তো! ফিসফিস করে বললে।

ঠোঁট টিপে হাসলো গৌরী, চোখের দৃষ্টিতে একটু যেন সান্ত্বনার অভিপ্রায় ফুটলো। তারপর হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সরে গেল সেখান থেকে।

কিন্তু কথাটা কাউকে না বলে যেন আনন্দ নেই। এমন গোপন আবিষ্কারটা গোপন রাখতে ইচ্ছে হয় না।

তাই পরের দিনই টিফিনের সময় আপিসের সামনের চায়ের দোকানটায় অন্য মেয়েদের সঙ্গে বসে জটলা করতে করতে বললে, আমার পরের বোনটার হার্ট-অ্যাটাক হয়েছে।

কোডের ভাষা। সকলেই হেসে উঠলো।

আর মন্দিরা বললে, এদিকে যে অসীমাভর থ্রম্বসিস, সেটা চেপে যাচ্ছো কেন?

প্রথম মাসের মাইনেটা যেদিন হাতে পেয়েছিল গৌরী, সেদিন যা আনন্দ হয়েছিল চাকরি পাওয়ার দিনও তেমন আনন্দ হয় নি। তখন কত ভয়। চাকরি পাওয়াই তো সব নয়, চাকরি রাখতে পারবে কি না। কাজকর্ম শিখে নিতে পারবে কি না। তার ওপর আপিসের প্রত্যেকটি মানুষ সম্পর্কে আতঙ্ক। কে কেমন ব্যবহার করবে! পদে পদে ভুল ধরে চাকরি খাওয়ার চেষ্টা করবে কি না।

আপিসের চাকরি সম্পর্কে কোনো ধারণাই তো ছিল না। বাবার কাছে জামাইবাবুর কাছে শোনা দু'চারটে কথা থেকেই যা ভেবে নিতে পেরেছিল।

ক্লি-ক। ক্লিক, ক্লিক, ক্লিক। এই একটা কথাই শুনেছে।

অসীমাভর অপমানটা তাই অত বেশী লেগেছিল মনে। একটু ভয়ও হয়েছিল।

দু'দিনেই কিন্তু সব ভুল ভেঙে গেল।

বড়বাবু বলেছিলেন, কনফার্মড হওয়া পর্যন্ত যা দু'একটা কাজ করছেন, কথা শুনছেন। তারপর আপনিও তো ওদেরই দলে মিশে যাবেন।

—কেন? হেসে জিগ্যেস করেছিল গৌরী।

বড়বাবু উত্তর দিয়েছিলেন, কনফার্মড হলে তো আর কেউ চাকরি খেতে পারবে না। ওই একটা কথা বলেই তো শাসায় ওরা।

—আপনাকেও শাসায়?

বড়বাবু হেসেছেন।—আমি তো তুচ্ছ, ছোটসাহেবই ঘাঁটাতে সাহস পান না। আড়ালে আবডালে কি বলে বেড়ায়, কানে তো আসে দু'চারটে।

গৌরী হেসে বলেছে, এ আপনার অন্যায় রাগ। কাজ করে না যদি তো আপিসের কাজ চলছে কি করে?

বড়বাবু চোখ থেকে পুরু লেন্সের চশমাটা খুলে তাকিয়েছেন এবার গৌরীর মুখের দিকে। তারপর ধীরে সুস্থে পানের কৌটো থেকে তিনটে খুদে সাইজের পান একসঙ্গে মুখে পুরেছেন। জর্দার কৌটো থেকে জর্দা বের করে বলেছেন, আপিসের কাজ চলে ওই অসীমাভর মতো দু'চারজন থাকে বলে।

গৌরী রসিকতা করে বলেছে, আসলে ওঁকে আপনি পছন্দ করেন, তাই এত সুখ্যাতি।

বড়বাবু পানের ছোপ-লাগা দাঁত বের করে হেসেছেন।—ভুল, সব ভুল। সবাই তাই ভাবে। কিন্তু চোখের সামনে দেখছেন তো ঘাড় গুঁজে কাজ করে, আবার ডিপার্টমেন্টালও পাস করলো এবারে। ও নির্ঘ্যাৎ উন্নতি করবে।

তা করুক, আপত্তি নেই গৌরীর। ওর নিজের ওসব উচ্চাশা নেই। মাসের মাইনেটা পেলেই ও খুশী।

সকলেরই বোধহয় তাই মনে হয়। কিন্তু প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে যে আনন্দ হয়েছিল পরের মাসে তা আর রইলো না কেন?

প্রথম মাসের মাইনেটা এনে পুরো টাকাটাই মা'র হাতে তুলে দিলো।—ছেলে হয়ে জন্মাই নি বলে তো খুব খোঁটা দিতে ছোট বেলায়। ছেলে তোমার সব টাকাটা চাকরি করে এনে দেয় কি না দেখবো।

বলে হাসলো গৌরী।

অশোকা দেবী হাত পেতে টাকাটা নিলেন, কিন্তু মুখে বললেন, তোর টাকা তোরই থাকবে। আমি এতে হাত দেবো না।

—কেন? আপত্তি করলো গৌরী। বললে, সে হবে না, আমার মাইনের টাকা সংসারের খরচে যাবে।

কটাই বা টাকা। তবু এটুকুও যে ও দিতে পারছে, সেই আনন্দই কি কম।

মা চুপ করে রইলো দেখে গৌরী আর কিছু বললে না।

কিন্তু বিকেলে বারান্দায় দাঁড়িয়ে মা আর বাবার কথা শুনতে পেলো ও। চাপা গলায় আলোচনা হচ্ছে।

বাবা বুঝি বললেন, সংসারের অবস্থা তো দেখতে পাচ্ছে ও, ও তো অবুঝ নয়। ঠিকই করেছে।

অশোকা দেবী বললেন, আমি জানতাম, তবু ভয় ছিল।

কথাটা শুনে প্রথমে খুশী হয়ে উঠেছিল। পরক্ষণেই কি মনে হতে একটা প্রচণ্ড ধাক্কা খেলো যেন।

'তবু ভয় ছিল!'

ধীরে ধীরে সেখান থেকে সরে গিয়েছিল গৌরী। পাছে মা-বাবা দেখতে পায়।

কিন্তু টাকাটা দিয়ে দেয়ার পর থেকেই নানান ভাবনা এসে জড়ো হলো।

সত্যিই তো, দু'খানা শাড়ি না কিনলেই নয়। আপিস যেতে হবে প্রতিদিন। গীতা গায়ত্রীর শাড়ি চেয়ে নিয়ে চালাতে হয়েছে মাঝে মাঝে।

রঞ্জিতের ওখান থেকে সব জামাকাপড় নিয়ে এলে হতো। ভুল করেছে সেগুলো ফেলে এসে। শ্যামলকে পাঠিয়ে আনানো যায়, কিন্তু না, আর কোনো সম্পর্ক না থাকাই ভালো। ফেলে দিক, পুড়িয়ে দিক, যা খুশী করুক রঞ্জিৎ।

পরের দিন আপিসে মন্দিরা অবিনাশ আরো অনেকে ধরে বসলো, খাওয়াতে হবে। প্রথম মাসের মাইনে পেয়ে এ আপিসে অনেকেই মাদ্রাজী দোকানে চা-পকৌড়া খাইয়েছে।

খরচ বেশী নয়, কিন্তু পাঁচটা টাকাই বা মা'র কাছে কি করে চাইবে গৌরী। হয়তো মা ভাববে, টাকা ক'টা হাতে তুলে দিয়ে নিজের প্রয়োজনেই একে একে চেয়ে নিচ্ছে।

শেষ অবধি এই পাঁচটা টাকাই চেয়ে নিয়েছিল। শাড়ি আর কেনা হয় নি।

কিন্তু পরের মাসের মাইনেটা পেয়ে ও ভাবলে কি করবে।

অনেক ভাবে পনেরোটা টাকা সরিয়ে রাখলো।

বাকী টাকাগুলো মার হাতে দিয়ে হাসতে হাসতে বললে, মা, পনেরো টাকা মাইনে কমে গেল এমাস থেকে।

—সে কি রে? মা আকাশ থেকে পড়লো।

গৌরী হেসে বললে, তা ছাড়া আর কি বলবো বলো। আপিসে সবাই মিলে কি একটা ফাণ্ড করেছে টাকা জমানোর, তাতে নাকি পনেরো টাকা জমা দিতে হবে।

অশোকা দেবীর মুখে হাসি ফুটলো।—তাই বল্। তা সে তো ভালোই, দরকার হলে ধার নেওয়া যায়।

গৌরী হেসে বললে, ভাগ্যিস কনফার্মড হই নি, তখন তো আবার প্রভিডেন্ট ফাণ্ড কাটবে।

অশোকা দেবী সান্ত্বনা দিলেন, তেমনি মাইনেও বাড়বে বছরে বছরে

মাইনেও বাড়বে বছরে বছরে !

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবছিল গৌরী। সারা জীবনই কি ও চাকরি করবে নাকি? চাকরি করে জীবন কাটিয়ে দেবে? মা-বাবা গীতা গায়ত্রীরা হয়তো তাই চায়। কে জানে।

পাশে তাকালো গৌরী। হ্যাঁ, অঞ্জু ঘুমিয়ে পড়েছে। সারাদিন হৈ-হুল্লোড় করে এসে বইয়ের পাতা খুলে বসতে না বসতে ঘুমে ঢুলতে শুরু করে মেয়েটা। এর মধ্যেই ঘুমিয়ে কাদা।

হাত বাড়িয়ে একবার ওর কাঁধের কাছে, হাতের ওপর, হাত রাখলো গৌরী। সত্যি, মানুষ ঘুমিয়ে পড়লে শরীরটা এমন নরম হয়ে যায় কেন? ও নিজেও কি এমনি হয়!

দূরে কোনো বাড়িতে ঘর ধোয়ার শব্দ হচ্ছে। ঝাঁটার সপসপ শব্দ আর বাসনের টুংটাং ভেসে আসছে থেকে থেকে। হয়তো মধুবাবুদের বাড়ি থেকে। ব্যবসাদার মানুষ, কাপড়ের দোকান আছে। কতদিন গৌরী দেখেছে আলো জ্বেলে অনেক রাত অবধি খেরোর খাতায় হিসেব মেলাচ্ছেন মধুবাবু। ভুরুর লোমগুলোও পেকে সাদা হয়ে গেছে। চোখে সোনার ফ্রেমের চশমা। অমন সুন্দর ডিজাইনের বাড়িটার সঙ্গে ভদ্রলোককে যেন একটুও মানায় না। ছেলেগুলো কিন্তু দিব্যি ফিটফাট, বাবু বাবু। বড় ছেলেটা কিছুদিন গৌরীর পিছনে লেগেছিল, ওর মনে আছে।

মনে পড়তেই নিজের মনেই হেসে ফেললো গৌরী।

—গীতা!

গৌরী চাপা গলায় ডাকলে একবার।

নিচে মেঝেতে বিছানা পেতে গীতা গায়ত্রী আর আরতি শুয়েছে, খাটের উপর গৌরী আর অঞ্জু। প্রথম প্রথম গায়ত্রী আর অঞ্জু খাটে শুতো। গীতাই জোর করে গৌরীকে খাটে শুতে বাধ্য করেছে। মাও। যেন খাটে শুলেই ভালো ঘুম হবে।

ঘুম কি বিছানার জন্যে হয়। যত নরম গদিই থাক্, মনে যার শান্তি নেই তার ঘুম কে এনে দেবে।

অন্য দিন অবশ্য ক্লান্তিতে ঘুমিয়ে পড়ে গৌরী। আজ কিছুতেই চোখের পাতা এক হচ্ছে না।

দূরের বস্তিটাতে কে চিৎকার করে ঝগড়া করছে। ডাক্তারের গাড়িটা চলে গেল, বোধহয় কল্ এসেছে। কি বিশ্রী শব্দ হয় গাড়িটায়।

গৌরীর মনে পড়লো। দিদির ছেলে বাচ্চু ওই শব্দে জেগে উঠে কাঁদতে শুরু করতো এক একদিন।

—গীতা!

আবার ডাকলে গৌরী।

—উঁ। এবার সাড়া দিলো গীতা।

—ঘুম আসছে না রে!

—আমারও।

গৌরী একটুক্ষণ চুপ করে রইলো। ভাবলো কি যেন। কি আর ভাববে। গীতার ঘুম আসছে না, জীবন শুরু করবে কি ভাবে তারই স্বপ্নে হয়তো। আর গৌরী ভাবছে, জীবন শেষ করবে কি করে!

রঞ্জিতের কথা মনে পড়তেই মাথার মধ্যে যেন এক ঝলকা রক্ত চিড়িক্ করে উঠলো। পিন ফোটানোর মতো একটা ব্যথা। না, কোনো দিনই আর তার কাছে ফিরে যাওয়া চলবে না।

—গীতা! আবার ডাকলে গৌরী।

—কি?

—পড়াশুনোটা মন দিয়ে কর, দেখছিস তো পড়াশুনোর কার কখন দরকার কেউ বলতে পারে না।

—হুঁ।

—আর একটু ভেবেচিন্তে চলবি। আমি ভুল করেছি, তোরাও যেন তাই করে বসিস না।

গীতা এবার আর কোনো উত্তর দিলো না।

গৌরীও চুপ করে রইলো একটুক্ষণ। তারপর বললে, আমাদের তো একবার ভুল করলে আর শুধরে নেবার উপায় নেই, তাই না ?

—কেন ?

—কেন কি রে ! আমি তো সব শেষ করেই এসেছি।

গীতা এবার ফিসফিস করে বললে, ডিভোর্স করবি না ?

—সে কি এতই সহজ ?

—সহজই তো।

—না রে। আর ডিভোর্স করেই বা কি লাভ হবে ?

—জীবন শুরু করবি আবার !

গৌরী হেসে উঠলো।—তা হয় না। তাছাড়া, কার কাছে কোন কারণটা বড়ো জজরা তার কি বুঝবে !

—কি হ'য়েছিল বল না ?

গৌরী বালিশ টেনে নিলো, দুহাত তার ওপর রেখে মাথা গুঁজলো।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিছু না। ঘুমো তুই।

বলে নিজেও ঘুমোবার চেষ্টা করলে।

গীতা বোধহয় একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো। কিংবা ওর নিজেরই দীর্ঘশ্বাস হয়তো।

টিফিনের সময় যে চায়ের দোকানটায় গিয়ে বসে ওরা, সেখানে সেদিন হুলুস্থুল ব্যাপার।

প্রত্যেকদিনই সেখানে কিছু না কিছু নতুন খবর অপেক্ষা করে থাকে। কোনোটা নির্দোষ রসিকতা, কোনোটা আপিসের অনাচারকে ঘিরে। গৌরীর কোনো কোনোদিন সে-সব আলোচনা ভালো লাগে, কোনোদিন বা লাগে না।

সেদিন ও গিয়ে দেখলে একটা টেবিল ঘিরে মন্দিরা অঞ্জলি ভারতী—সবাই বসেছে ঘন হয়ে, কনুইয়ে ভর দিয়ে মুখের কাছে এনে চাপা গলায় কি যেন বলাকওয়া করছে।

প্রথমটা গৌরী অপ্রতিভ বোধ করলো। আলোচনা ওকে নিয়েই নয় তো!

না। ভারতী ডেকে বসলো, এই যে গৌরী, ভাবলাম আজ বুঝি অ্যাপয়েন্টমেণ্ট আছে।

মোটাসোটা কালো চেহারা ভারতীর, কানের পাশে সামান্য চুল সাদা হয়ে আসছে। তবু বয়সটা সত্যিই হয়তো তেমন বেশী নয়। অন্তত হাবভাব কথাবার্তায় তা মনে হয় না। অনেকেই তাই 'ভারতীদি' বলে ডাকে।

গৌরী এবার সহাস্যে এগিয়ে এলো—কিসের ষড়যন্ত্র চলছে শুনি।

চেয়ার টেনে নিয়ে বসলো গৌরী।

ভারতী বললে, অসীমাভর সঙ্গে যে-ভাবে কথা বলছিলি, ভাবলাম, আজ আর এখানে আসবি না। দ্যাখ, তবু যদি বিশ্বামিত্রের ধ্যানভঙ্গ হয়।

—আপনারা বুঝি পারেন নি?

সবাই হেসে উঠলো এ-কথায়। তারপর মন্দিরা চাপা গলায় বললে, খবর আছে আজ।

—কি খবর? উৎসুক হলো গৌরী।

মন্দিরা ধীরে ধীরে বললে, বাণী গুপ্তকে দেখে তোমার কোনোদিন কিছু সন্দেহ হয়েছে?

—না তো। গৌরী বুঝতে পারলো না। বিস্ময়ের চোখ তুলে তাকালো। যেন সাঙ্ঘাতিক কিছু একটা খবর শুনতে পাবে এখনই।

ভারতী গম্ভীর গলায় বললে, ও বিধবা।

—তাই নাকি? শুধু একটা অজানা খবর জানতে পারার

চমক। আর কিছু নয়। গৌরীর পরক্ষণেই মনে হলো, এ-খবরে এত চাঞ্চল্যের কি আছে।

মন্দিরা চাপা গলায় বললে, কি ভীষণ মেয়ে দেখো, তিন বছর দেখছি, এক সঙ্গে গল্প করছি, সিনেমা গেছি, দিব্যি সাজগোজ করে বেড়ায় যেন আঠারো বছরের কুমারী মেয়েটি।

গৌরী কেমন যেন একটা ঘা খেল। চুপ করে রইলো খানিক, তারপর বললে, তা কি থান পরে থাকবে নাকি আজকালকার দিনেও?

ভারতী জবাব দিলো এ-কথার। বললে, তা নয়, কিন্তু আমাদের কাছে সেটা চেপে গেছে কেন? বললে কি এমন মহাভারত অশুদ্ধ হতো?

গৌরী একবার ভাবলে উত্তর দেয়, পরক্ষণে মত বদলে ফেললো। না, এদের কাছে বাণীর হয়ে ওকালতি করে কি লাভ।

বাকী সময়টুকুও সমানে তাদের সঙ্গে আড্ডা দিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে নিজের টেবিলে ফিরলো গৌরী। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কাঁটা যেন থেকে থেকেই খচখচ করে উঠলো।

সারাটা দিন ঘুরেফিরে ভারতীর কথাটা মনে পড়লো। আর তাই কেমন যেন সহজ হতে পারলো না ও।

প্রতিদিনই দু'একটা কথা বলে সে অসীমাভর সঙ্গে, অন্য অনেকের সঙ্গেও। বড়বাবু পান চিবোতে চিবোতে তাঁর পারিবারিক ঝঞ্ঝাটের বৃত্তান্ত শোনান, আগ্রহ নিয়ে শোনে গৌরী। কিন্তু আজ যেন সকলকে এড়িয়ে এড়িয়ে চলতে চাইলো।

ছুটির পর একে একে সকলেই ফাইলপত্তর গুটিয়ে রেখে একরকম ছুটতে শুরু করেছে। একটু আগে যেতে পারলে বাসের ভিড়টা কম হয়। কোনো কোনোদিন গৌরীও ওদের মতোই একটু তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে।

আজও হয়তো সকলের পিছনে পিছনে ও নেমে যেত। কিন্তু

অসীমাভর টেবিলের পাশ দিয়ে যেতে যেতে তার চোখে চোখ পড়ে গেল।

—চললাম। একটু সৌজন্যের হাসি হেসে অসীমাভকে এড়িয়ে যেতে চেষ্টা করলো।

—এক মিনিট। আমারও হয়ে গেছে।

অসীমাভর কাছ থেকে এমন কথা একটু অপ্রত্যাশিত বইকি। অন্য দিন হলে হয়তো মনে মনে খুশী হতো গৌরী। আজ পারলো না। তবু অভদ্রতা করে চলে যাওয়া তো যায় না। তাই বিস্ময়ের সুরে বললে, সে কি, আপনার এর মধ্যে কাজ শেষ হয়ে গেল?

অসীমাভ কাগজপত্তর গুছিয়ে রাখলো। লাল নীল পেন্সিল, পিনকুশন, পেপারওয়েট ইত্যাদি একে একে দেরাজে চালান দিলো। চাবি দিলো দেরাজে। এদিক ওদিক নেড়েচেড়ে দেখলো কিছু পড়ে রইলো কি না, দেরাজটা টেনে দেখলো চাবি লেগেছে কি না।

তারপর বললে, চলুন।

ফিরে তাকালো গৌরী দরজার দিকে। আর ঠিক সেই মুহূর্তে মন্দিরা ওদের দিকে এক চোখ তাকিয়েই মুচকি হেসে সিঁড়ি বেয়ে নেমে গেল।

অসীমাভ কিন্তু এসব কিছুই লক্ষ্য করে নি। ওর মনের মধ্যে তখন অন্য কোনো গুঞ্জন শুরু হয়েছে হয়তো। না, লিফ্‌টে জায়গা পাওয়া যাবে না। ওপর তলা থেকেই লোক বোঝাই হয়ে আসছে। অপেক্ষা করে লাভ নেই।

সিঁড়ি বেয়েই নামতে শুরু করলো অসীমাভ। হুড়দাড় করে অসংখ্য লোক নামছে। ভিড় এড়াতে গিয়ে, কিংবা টাল সামলাতে গিয়ে একবার বুঝি মুহূর্তের জন্যে অসীমাভর কাঁধে হাত দিয়ে ফেলেছিল গৌরী। কথাটা একটু পরে মনে হতেই কেমন যেন লজ্জা পেলো।

অসীমাভ নিচে নেমে এসে একটু ফাঁকা পেয়ে কথা বললো।—ডিপার্টমেণ্টাল পরীক্ষাটা দেবার জন্যে তৈরি হোন।

—পরীক্ষা ? চোখ কপালে তুললো গৌরী।

হেসে বললে, কনফার্মড হই আগে।

—সে তো হবেনই, আজ না হোক্, কাল। সময় নষ্ট করে কি লাভ !

গৌরী খিলখিল করে হেসে উঠলো।—আবার পরীক্ষা ? ওসব আমার দ্বারা হবে না।

তারপর একটু থেমে হঠাৎ কৌতুকের স্বরে বললে, আপনি বুঝি সময় নষ্ট করতে চান না ?

হয়তো কথাটার মধ্যে অন্য কোনো অর্থের ইশারা পেলো অসীমাভ। একটু লজ্জা পেলো।

তারপর বললে, ভাবছি এবার ডবল বি সি এস পরীক্ষাটা দিয়ে দেবো। মনে হচ্ছে, পাস করতে পারবো।

—ডবল বি সি এস ! ডবল বি সি এস দেবেন আপনি ? গৌরী যেন বিস্মিত হলো ওর কথা শুনে।

অসীমাভ ধীরে ধীরে বললে, নিজের জীবন তো নিজেকেই গড়ে নিতে হবে, আর কেউ তো গড়ে দিয়ে যাবে না।

একটু থেমে বললে, চিরকাল কি কেরানী হয়েই থাকবো ? কেরানী থেকে বড়বাবু ?

গৌরী যেন চমকে উঠলো মুহূর্তের জন্যে। বিস্ময়ের চোখে তাকালো সে অসীমাভর মুখের দিকে। কি আশ্চর্য, এমন কথা তো কেউ বলে না ! বরং উল্টোটাই বলে। কেরানী হয়েই সারা জীবন কাটাতে হবে ! ও নিজেও তো তাই ভাবে।

অসীমাভকে শ্রদ্ধার চোখে দেখতে ইচ্ছে হলো। কিন্তু ততক্ষণে ওর চোখ গিয়ে পড়েছে একটু দূরে।

আর বাস-স্টপের দিকে যেতে যেতে সেদিকে চোখ পড়তেই ভয়ে বুক দুলে উঠলো গৌরীর। ভয় ? হ্যাঁ, মুহূর্তের জন্যে ভয় পেলো গৌরী, রঞ্জিৎকে দেখতে পেয়ে।

কিন্তু গৌরীর দিকে তাকিয়ে ওখানে দাঁড়িয়ে আছে কেন রঞ্জিং ? কিছু বলতে চায় ?

গৌরীর ভীষণ ইচ্ছে হলো আর একবার ফিরে তাকায়। ফিরে তাকিয়ে দেখে এখনো রঞ্জিং ওকে লক্ষ্য করছে কি না।

রঞ্জিৎ কি ওর জন্যেই দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করছে? কিছু বলতে চায়?

না, আর একবারও ফিরে তাকালো না গৌরী। পরিবর্তে হঠাৎ আরো অন্তরঙ্গ হবার চেষ্টা করলো অসীমাভর সঙ্গে।

হাসতে হাসতে, যেন কত ঘনিষ্ঠ কথা বলতে চায়, এমনভাবে প্রশ্ন করলে, বাড়ি ফিরেই বুঝি পড়তে বসেন ?

—না, না। একটু লজ্জা পেলো অসীমাভ। বললে, এখান থেকে সটান চলে যাই একটা পাবলিসিটি ফার্মের একাউন্টস দেখে দিতে।

—ও।

গৌরীর বাস এসে দাঁড়িয়েছে ততক্ষণে। হয়তো চেষ্টা করলে গৌরী উঠতে পারতো. উঠলো না।

একটু পরেই অসীমাভর বাস এলো।

অসীমাভ তাকালো গৌরীর মুখের দিকে।

—চলি। মৃদু হেসে বললে।

বলেই দু'পা এগিয়েছে সে, পিছন থেকে হাসতে হাসতে তার হাতটা টেনে ধরলো গৌরী। বললে. পরেরটায় যাবেন।

অসীমাভ থেমে পড়লো। হাসলো।

দেখুক রঞ্জিৎ, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখুক। বুঝে নিক যে ওর সঙ্গে গৌরীর আর কোনো সম্পর্ক নেই।

একটু পরেই গৌরীর বাস এলো আবার, ভিড় ঠেলে কোনোরকমে উঠলো গৌরী, তারপর—না, অসীমাভর দিকে তাকালো না। শুধু রঞ্জিৎকে খুঁজলো. রঞ্জিং এখনো দাঁড়িয়ে আছে কি না, দেখেছে কি না ?

কিন্তু, আশ্চর্য! কোথায় গেল সে। দূরে কোথাও সরে গেছে

কি না খুঁজতে যাওয়ার আগেই ভিড়ের চাপে ভিতরে ঢুকে পড়তে হয়েছে ওকে।

তবু মনটা খুশীতে ভরে উঠলো গৌরীর।

একসময় কত কি স্বপ্ন দেখেছিল গৌরী, বিয়ের পর একে একে তা ভেঙে গেল কেন? রঞ্জিৎকে চিনতে কি তার ভুল হয়েছিল!

কিন্তু গৌরীকে সত্যিই তো সে ভালোবাসতো। ভালোবেসেই বিয়ে করেছিল। কোথাও কোনো বাধা পড়ে নি, জীবনকে কেউ বিষিয়ে দেয় নি।

তবু রঞ্জিৎদের পরিবারের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারে নি গৌরী। না কি রঞ্জিৎই তাকে মানিয়ে চলতে দেয় নি। আজ আর ভালো করে বুঝতেও পারে না গৌরী, দোষটা কার।

রঞ্জিতের মা বোন, রঞ্জিতের বাবা—সকলেই তো প্রথম প্রথম খুশী হয়েছিল। যেটুকু বা অসন্তোষ ছিল তাঁদের মনে, গৌরীকে দেখে, গৌরীর ব্যবহারে সেটুকুও মুছে গিয়েছিল।

গৌরী নিজেই কি কম চেষ্টা করেছিল সংসারের সঙ্গে মিশে যেতে।

রঞ্জিতের ছোট বোন অনিমা বলতো, তোমার মতো রূপ যদি পেতাম বৌদি, দিনরাত সেজে থাকতাম আমি।

বলে জোর করে সাজিয়ে দিতে চাইতো অনিমা।

গৌরী হাসতো, বলতো, আমি এখন ঘরের বৌ। সেজেগুজে কি হবে, বরং তুমি আমার এই শাড়িটা পরো আজ।

নিজের কোনো ভালো শাড়ি বের করে অনিমাকে পরিয়ে দিতো। সাজিয়ে দিতো নিজের হাতে, বলতো, কি সুন্দর মানিয়েছে তোমাকে।

কখনো সকালে বঁটি পেতে বসতো কুটনো কুটে দেবার জন্যে। শাশুড়িকে বলতো, আপনি উঠুন মা, আমি করে দিচ্ছি।

কোনোদিন বা নিজেই আগেভাগে বসে পড়তো দুধ গরম করতে, সকলের জলখাবার তৈরি করতে। আর রঞ্জিতের মা তার হাত থেকে কাজ কেড়ে নিয়ে বলতেন, তোমাকে এসব করতে হবে না বৌমা, তুমি বরং বসে বসে গল্প করো আমার সঙ্গে।

অভিযোগ করতেন, ছেলের তো টিকি দেখা যায় না, সারাদিন টো টো করে বেড়ায়, মেয়েরা ইস্কুলে-কলেজে। আমার তবু একটা গল্প করার লোক হলো।

বলে হাসতেন।

আশ্চর্য, সেই মানুষেরা কি করে যে দিনে দিনে বদলে গেল। হয়তো রঞ্জিতের দোষেই।

প্রথম কয়েকটা মাসের ঘোর কেটে যেতেই গৌরী দেখলে কেমন করে যেন একে একে সংসারের কাজের ভারটা, সেই তুলে নিয়েছে নিজের কাঁধে।

আর তখন থেকেই শুরু হলো মনোমালিন্য, কলহ-বিবাদ।

রঞ্জিতের মাথায় তখন সিনেমার নেশা ঢুকেছে। ক্যামেরাম্যান হবে, ছবি তুলবে।

গৌরীর নিজেরও ভালো লাগতো সে-স্বপ্ন। ছোট্ট একটা ছবির দোকান খুলে লোকের ফটো তুলে কি হবে। টাকা হয়তো আছে, কিন্তু সিনেমার ক্যামেরাম্যানের সম্মান কি কম নাকি ?

গৌরী উৎসাহ দিতো। আর এই সময়েই রঞ্জিতের নেশা ধরলো গৌরীকে নিয়ে হৈ-হুল্লোড় করে বেড়ানোর। আজ সিনেমা, কাল থিয়েটার। কোনোদিন রঞ্জিতের বন্ধুদের সঙ্গে ডায়মণ্ডহারবারে পিকনিক। পার্ক স্ট্রীট পাড়ার রেস্তরাঁ।

উঁচু মহলের মানুষ হবার স্বপ্ন দেখতো রঞ্জিৎ, আর গৌরীকে তার সেই সমাজের যোগ্য করে তুলতে চাইতো।

অনিমা চটতো।—নিজেরা রোজ তো সিনেমা থিয়েটার যাও, আমাকে নিয়ে যেতে হলেই···

গৌরী বলতো রঞ্জিৎকে, আর রঞ্জিৎ অকারণেই রেগে যেত।—না, না, ওদের নিয়ে যেতে হয় তো তোমরা যাও।

রঞ্জিতের মাও এত হৈহৈ পছন্দ করতেন না। অথচ ছেলেকে বলতে সাহস পেতেন না। যা কিছু বলার, সবই শোনাতেন গৌরীকে।

—তোমার বন্ধুদের সঙ্গে পিকনিক টিকনিক মা পছন্দ করেন না। অনুযোগ করতো ও। যেতে চাইতো না।

এমনি সব তুচ্ছ ব্যাপার থেকেই কেমন করে যে এত বড় ভাঙন ধরলো।

একটা ছবিতে সত্যি সত্যিই একদিন কাজ পেলো সে। খবরের কাগজের খবরে ছোট অক্ষরে রঞ্জিতের নামও বের হলো। কি খুশীই না হয়েছিল সেদিন গৌরী।

বাপের বাড়িতে এসে গীতা গায়ত্রীদের দেখিয়েছিল। সবাই খুশী হয়েছিল।

আর সেই সময়েই একদিন রঞ্জিতের সঙ্গে রাত বারোটায় বেড়িয়ে ফিরলো গৌরী। কাকদ্বীপে গিয়েছিল এক বন্ধুর গাড়িতে। গাড়িটা খারাপ হয়ে যাওয়ায় এই ঝঞ্ঝাট।

সকালের দিকে বেরিয়ে গিয়েছিল ওরা। সব কাজের ভার শাশুড়ির ওপর ফেলে দিয়ে। তাই মনে মনে গজরাচ্ছিলেন তিনি।

রাত জেগে বসেছিলেন, মনের মধ্যে যতখানি রাগ, ততখানি আশঙ্কা ছেলের জন্যে, গৌরীর জন্যে।

ওরা ফিরে আসতেই রঞ্জিতের মা বলে বসলেন, তোমার কি এতটুকু আক্কেল নেই বৌমা, সেই সকালে গিয়েছো, রাত বারোটা বাজলো। পাড়াপড়শিরা বলবে কি রোজ রোজ এমন করলে।

অনিমা কাছেই ছিল। সে ফোড়ন কাটলো, দুদিন পরে বৌদিকে হয়তো সিনেমায় নামাবে, তখন তো···

রেগে ফেটে পড়লো রঞ্জিৎ।

কি বলেছিল সে, কি না বলেছিল কিছুই মনে নেই গৌরীর।

কিন্তু সেদিন থেকেই জীবনের সমস্ত আনন্দের ঢেউ একরাশ বালি ছড়িয়ে দিলো সর্বাঙ্গে।

সত্যিই একটা ছোট্ট কম ভাড়ার ফ্ল্যাট যোগাড় করে উঠে এলো রঞ্জিৎ। হাতে তখন কিছু টাকা পেয়েছে। শাশুড়ি আর অনিমার চোখে জল দেখতে পেলো গৌরী, তার গলার স্বরও ভারী হলো।

তবু, তখন আর ফেরার সময় নেই। রঞ্জিৎ আর গৌরী সরে এলো। সরে এলো, কিন্তু মন পড়ে রইলো সেখানেই। ভেবেছিল, মুক্তির সাগরে পৌঁছবে। পৌঁছে দেখলো, মনে পড়ে আছে সেই বন্ধনের দ্বীপে।

রঞ্জিতের হাবভাবও কেমন যেন বদলে যেতে শুরু করলো তখন থেকেই। সেই উল্লাস আনন্দ নেই। গৌরী বুঝতে পারতো ব্যথাটা কোথায়। কাজের মধ্যে কেন সব সময় ডুবে থাকতে চায়।

মাঝে মাঝে বলতো, চলো অনিমাদের সঙ্গে দেখা হয় নি অনেকদিন।

যেতো রঞ্জিৎ, কিন্তু ফেরার পথে একটাও কথা বলতো না। গম্ভীর হয়ে থাকতো, যেন একটা অসহ্য বেদনাকে চেপে রাখার চেষ্টা।

এমনিভাবেই দিন কেটে যাচ্ছিল। কিংবা দিন কাটছিল না গৌরীর। ছবি উঠছে তখন রঞ্জিৎদের। সকালে চা খেয়েই বেরিয়ে যায় সে, কোনো কোনো দিন অনেক রাতে ফেরে।

একা, সম্পূর্ণ একা হয়ে পড়ে তখন গৌরী। কোনো কোনো দিন গীতাদের সঙ্গে গল্প করতে যায়, কোনোদিন বা দোকানে দোকানে ঘুরে আসে।

তারপর রাত্রে ক্লান্ত হয়ে ফিরে আসে। বাড়ি ফিরে কোনোদিন খায়, কোনোদিন খায় না। বলে, স্টুডিওতে খেয়ে এসেছি।

এমনিভাবেই চলছিল।

কিন্তু সেদিন ক্লান্তিতে রঞ্জিৎ যখন এসেই শুয়ে পড়লো বিছানায়,

আর গৌরী আলো নিভিয়ে বালিশটা টেনে নিয়ে রঞ্জিতের পাশে শুতে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ও থমকে রইলো মুহূর্তের জন্যে।

আলো জ্বাললো।

হ্যাঁ, রঞ্জিৎ ঘুমিয়ে পড়েছে।

সন্দেহের দৃষ্টিতে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো গৌরী।

তারপর ধীরে ধীরে নিচে মেঝেতে একটা মাদুর বিছিয়ে শুয়ে পড়লো।

না, রাগ হয় নি। ভেবেছিল বন্ধু বান্ধবের পাল্লায় পড়েই হয়তো মদ—'মদ' কথাটা নিজের কানেই খারাপ শোনালো। আশা করলে, রঞ্জিৎ নিজেই সকালে হাসতে হাসতে বলবে, কাল একটু ড্রিঙ্ক করতে হলো ওদের পাল্লায় পড়ে।

বললে একটা ধমক দিতো হয়তো গৌরী, কিন্তু ক্ষমাও করতো। কিন্তু, না, কোনো কথাই প্রকাশ করে বললো না রঞ্জিৎ।

তারপর আবার একদিন ঐ দুর্গন্ধটা নাকে এলো। স্টুডিও থেকে ফিরে এসে বিছানায় শুয়ে শুয়ে একটা পত্রিকার ছবি দেখছিল রঞ্জিৎ।

তার চোখের সামনেই মাদুরটা নিচে মেঝেতে পাতলো গৌরী।

রঞ্জিৎ মৃদু হেসে প্রশ্ন করলে, কি হলো, নিচে কেন?

গৌরী হাল্কাভাবে বললে, তোমার যা ঘামের গন্ধ, পাশে শোয়া যায় না।

কথাটা শুনে প্রথমটা গম্ভীর হয়ে গেল, তারপর হেসে উঠলো। বললে, তা হবে। চান করি নি তো আজ। সারাদিন যা খাটুনি যায়···

গৌরী কোনো কথা বললে না। না, ও বলবে না কিছু। জানাবে না যে ও সবই জানে, জানতে পেরেছে।

কি লাভ হবে বলে। বরং যেটুকু বা আড়ালে রাখতে চায় সেটুকুও সরিয়ে দেবে রঞ্জিৎ। হয়তো গৌরী জানতে পারবে এই

আশঙ্কাটাও আর থাকবে না তখন। হয়তো বাড়িতে মদের বোতল নিয়ে আসবে।

তার চেয়ে···

বাবা যদি জানতে পারে, মা যদি শুনতে পায়—এই ভয়টাই তখন প্রধান। তা হ'লে গীতাদের কাছে মুখ দেখাতে পারবে না গৌরী।

কিন্তু ঘামের গন্ধ বলে যেটাকে উড়িয়ে দিতে চাইলো সেটাই যে রঞ্জিৎকে নির্ভয় করে তুলবে তা কে জানতো।

রঞ্জিৎ কি ভেবেছিল গৌরীকে? বোকা, বোকা, বোকা!

—কি ভেবেছো তুমি আমাকে! বোকা, কিছু বুঝি না আমি? একদিন রাগে ফেটে পড়লো গৌরী।

মনের ফাটল যে অনেক আগেই ধরেছিল গৌরী বুঝতে পারে নি।

তাই সেদিন রঞ্জিতের কথাটা শুনে শিউরে উঠেছিল ও। রাগে অপমানে অনুশোচনায় শুধু স্থির দৃষ্টিতে রঞ্জিতের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল।

রঞ্জিতের মুখ থেকে এমন একটা কথা শুনতে হবে কোনোদিন কল্পনাও করে নি গৌরী।

বৃষ্টি, বৃষ্টি, বৃষ্টি।

বৃষ্টিরও যেন একটা নিয়ম আছে। সারাদিন, সারা রাত তার দেখা মেলে না, কিন্তু ঠিক আপিস যাবার সময়, আর আপিস ছুটি হলেই সেও দেখা দেবে। শুধু বৃষ্টিতে ভিজলেই কি সমস্যা মিটবে? তা নয়।

আপিসে তাই বর্ষার দিনে ওই আলোচনা।

—নিজে উঠতে পারি না, আবার ছাতা নিয়ে বাসে উঠবো!

—চটির ছিটে লেগে কাপড় নষ্ট হয়, রোজ রোজ কাপড় বদলাও।

—চারখানা ধুতি নিয়ে কারবার, ডাইং ক্লিনিং থেকে আর্জেণ্টে ধোয়াতে হয়। তার পয়সা গুনে দাও, আর এদিকে পাঁচটা ধোপ যেতে না যেতে কাপড় ফেটে চৌচির…

—আর্জেণ্টে মশাই আগেও ধুইয়েছি, আজকাল মিলগুলো এমন ধুতি বানায় যে দু'মাস টিকবে না।

—এদিকে দাম বাড়াচ্ছে, ওদিকে কোয়ালিটি খারাপ হচ্ছে।

—বৃষ্টির জন্যে দশ মিনিট দেরি হলো তো আপিসেও লাল দাগ পড়ে যাবে, সে সমস্যাই কি কম নাকি!

—আর বলবেন না, শালার রাস্তাগুলোও এমন, এক পসলা হলো কি না হলো, ট্রাম বাস বন্ধ।

—ওই তো মজা, কর্তারা হাজরে-খাতাটাই চেনেন, ট্রামবাসের খবর রাখেন না।

—হবে রে বাবা হবে, সব ব্যবস্থা হবে। সাহেবদের গাড়ি যেদিন অচল হবে, সেদিন দেখো কোনো কড়াকড়ি থাকবে না!

—তা ঠিক, দুদিন যেতে দাও, মহাপ্রভুদেরও একই হাল হবে।

এমনি নানান আলোচনা চলে। কোনো কোনো দিন তারা একটু উত্তেজিতও হয়ে পড়ে, ওপরওয়ালাদের বিরুদ্ধে কটুকাটব্য করে। মনের ঝাল মেটায়।

অথচ একবার আপিসে এসে পৌঁছতে পারলে বৃষ্টিটা ভালোই লাগে। বেশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা একটা আমেজে মন ভরে থাকে। সন্ধ্যোয় বাড়ি ফিরে কেউ কেউ রেডিওর গান শোনে, বর্ষার গান। ডালহৌসী স্কোয়ারের মন মুহূর্তের জন্যে চলে যায় রামগিরি আশ্রমে। বর্ষা ঋতুকে বড় সুন্দর মনে হয় তখন।

গৌরীর মনটাও তাই ফূর্তিতে গুনগুন করছিল আপিসে বসে

বসেও। দুপুরে এক সময় মেঘ ঘন হয়ে এসেছে, রোদ ম্লান হয়ে একটা কালো ছায়া নেমে এসেছে সকলের চোখের সামনে।

পর পর দুটো দিন অসহ্য গরমে কেটেছে। বৃষ্টি হয় নি। তাই বৃষ্টির জন্যে সকলের মনই ছটফট করেছে। এ যেন আত্মীয় বিরোধের মতো। কাছে থাকলে কলহবিবাদ, অশান্তি। ছেড়ে চলে গেলেও বুকের ভেতরটা টনটন করে ওঠে।

তাই আপিসের বিরাট বিরাট জানালা দিয়ে যে ছোট্ট এক টুকরো আকাশ দেখা যায়, পাশের পাঁচ তলা বাড়িটার ছাদের কোণ ঘেঁষে, সেখানে ছাই-রঙা একটা গ্যাস বেলুনের মতো একটুকরো মেঘ দুলতে দেখে গৌরীর মনও আনন্দে নেচে উঠেছিল।

জানালার কাছে সবাই ছুটে এসেছিল। গৌরী, মন্দিরা, ভারতীদি—আরো সকলে। বঙ্কিম, সোমনাথ—আরো অনেকে। রাস্তায় বাজনার শব্দ শুনে ছোট ছেলেমেয়েরা যে-ভাবে বারান্দায় ছুটে আসে।

তারপর বৃষ্টি নেমেছিল এক সময়। অঝোর ধারায় বৃষ্টি।

কিন্তু সব আনন্দ মিইয়ে গেল, ছুটির সময়েও সে-বৃষ্টি থামতে না দেখে। তবু আপিসে বসে থাকতে ভালো লাগে না, মনে হয় জেলখানা। বেরিয়ে গিয়ে কোথাও একটা গাড়ি-বারান্দার তলায় দু'ঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকা—সেও ভালো।

অসীমাভর টেবিলের সামনে দিয়ে বের হতে হয় গৌরীকে। বের হতে গিয়ে কৌতুকের হাসি হেসে থেমে পড়লো ও।

বললে, কি ব্যাপার! আর প্রোমোশন নিতে হবে না, উঠুন উঠুন।

অসীমাভ চোখ তুলে লজ্জিত হাসি হাসলো।

ফাইলে কাগজপত্র গুছিয়ে রাখতে রাখতে বললে, উঠেই বা কি লাভ? সেই তো নিচে গিয়ে বৃষ্টির ছাটে দাঁড়িয়ে থাকতে হবে!

গৌরী নিজেই এবার ফাইলের ফিতেটা বেঁধে দিলো।—উঠুন মশাই উঠুন, সেও অনেক ভালো। ফাঁকা হাওয়া আছে সেখানে।

অগত্যা উঠে পড়তে হলো অসীমাভকে।

ছু'জনে পাশাপাশি সিঁড়ি বেয়ে নেমে এলো। রাস্তায় জলের চেয়ে লোক জমেছে বেশী। ছু'একটা রুটের বাস চলছে, অন্যগুলো সব বন্ধ।

ঝিরঝির করে বৃষ্টি পড়ছে তখনও। ওরা ছু'জনে একটু ভিজতে ভিজতেই সামনের গাড়ি বারান্দাটার উদ্দেশে দ্রুত এগিয়ে গেল। আর বৃষ্টির ছাট থেকে মাথা বাঁচাবার জন্যে শাড়ির আঁচলটা আলতো-ভাবে ঘোমটার মতো করে মাথায় ঢাকলো গৌরী।

অসীমাভ বোধহয় আড়চোখে একবার দেখলো। আর ওপাশের বাস-স্টপে মন্দিরাকে ওর দিকে তাকিয়ে অর্থপূর্ণ হাসি হাসতে দেখে আঁচলটা মাথা থেকে সরিয়ে দিয়ে গৌরী নিজেও মৃছু হাসলো। ফাজিল! ও কি ভেবেছে অসীমাভর প্রেমে পড়েছে গৌরী?

ক্ষণিকের জন্যে কি ভেবেই নিজেরই অজান্তে বাঁ হাতের একটা আঙুল বোলালো গৌরী, নিজের সিঁথিতে।

অসীমাভ নিজের মনেই যেন বললে, সন্ধ্যের কাজটা আর থাকবে না।

খিলখিল করে হেসে উঠলো গৌরী।—আপনার কি কাজ ছাড়া আর কিছুই ভালো লাগে না?

অসীমাভ অপ্রতিভ চোখ তুলে তাকালো গৌরীর মুখের দিকে। —না। মানে প্রতিদিনই দেরি হচ্ছে···

—হোক্ না দেরি, এত টাকা রোজগার করে কি করবেন?

অসীমাভ হাসবার চেষ্টা করলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, টাকার আমার বড় দরকার, সত্যি বড়ো দরকার।

গৌরী আবার হেসে উঠলো।—সে আর নতুন কথা কি? টাকার কার না প্রয়োজন?

—না, না। বাধা দিয়ে সমস্যাটা বোঝাবার চেষ্টা করলো অসীমাভ। বললে, আপনি জানেন না, আমার অবস্থাটা···

গৌরী ওর গলার স্বরে কিসের যেন আভাস পেলো। অন্তরঙ্গ সহানুভূতির দৃষ্টিতে তাকালো ও অসীমাভর মুখের দিকে।

অসীমাভ ধীরে ধীরে বললে, চলুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। মানে, যদি কিছু মনে না করেন···

ঠোঁট টিপে হাসলো গৌরী।—বেশ তো, যাবো একদিন।

—যাবেন? সত্যি যাবেন? খুশীতে সমস্ত মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠলো অসীমাভর। বললে, দিদি তাহলে এত খুশী হবে···

পরিহাসের স্বরে লাগাম টানলো গৌরী। ধীরে ধীরে প্রশ্ন করলো, আপনার দিদি? আপনার কাছে থাকেন?

একটা দীর্ঘশ্বাসের শব্দ শুনতে পেলো গৌরী। আরো কিছু শোনার আশায় চুপ করে রইলো উদাসভাবে, বৃষ্টি ঝিরঝির রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে। ওদের বাসও চলতে শুরু হয়েছে, কিন্তু ভিড় বোঝাই হয়ে আসছে। পাদানিতেও জায়গা নেই।

অসীমাভর হয়তো এ-সবের দিকে দৃষ্টি নেই। ওর মন তখন সংসারের দুশ্চিন্তাঘেরা ছোট্ট ফ্ল্যাটখানিতে পৌঁছে গেছে।

অসীমাভ ধীরে ধীরে বললে, বছর দুই আগে বিধবা হয়েছে, তিনটি ছেলেমেয়ে···কি আর করবে, নার্সিং পড়ছে এখন···

খুব সাধারণ দুঃখের কথা। এমন তো কত সংসারেই আছে। অসীমাভর গলার স্বরে, বলার ধরনে কি যেন ছিল, গৌরীও যেন অসীমাভর দিদির জন্যে দুঃখবোধ না করে পারলো না।

—নার্সিং শিখে চাকরি না করে উপায় নেই, তবু—চাকরি করতে বড় লজ্জা দিদির। আপনাদের কথা শুনে সাহস পেয়েছে···

যাক্, একটা ভার নেমে গেল গৌরীর বুকের ওপর থেকে। ও যা ভয় পায়, ও যা আশঙ্কা করেছে তা নয় তা হলে। হয়তো অসীমাভ চায় গৌরীও গিয়ে ওর দিদিকে সাহস দেয়, আশাভরসা পায় ওর দিদি গৌরীকে দেখে।

গৌরী নিজেই বললে, কবে নিয়ে যাবেন বলুন, যাবো আপনার দিদির সঙ্গে আলাপ করতে।

—সত্যি, দিদি তা হ'লে এত খুশী হবে!

বাড়ি ফেরার পথে বাসে একা বসে বসে অসীমাভর কথাগুলোই ভাবছিল গৌরী। ভাবতে ভাবতে নিজের মনেই হেসে ফেললো। দিদি খুশী হবে! সত্যি কি তাই! শুধু দিদিকে খুশী করার জন্যেই অসীমাভর এই অনুনয়! না, অন্য কিছু? দিদির আড়ালে সে নিজেও কি খুশী হতে চায় না? তবে, সে কথাটা স্পষ্ট করে বলে না কেন? বাড়ি ফেরার পরও কেমন একটা মুগ্ধতার রেশ ওকে চারপাশ থেকে জড়িয়ে থাকে। রঞ্জিতের তাচ্ছিল্যের কাছে, তার অপমান গৌরীকে একদিন বড় দুর্বল করে দিয়েছিল। আজ অসীমাভর চোখে আবার যেন নতুন করে ফুটে উঠতে চাইছে। যেন নতুন এক মর্যাদা।

অস্ফুট একটা গানের কলি ভাঁজতে ভাঁজতে বাড়ি ঢুকলো গৌরী। শাড়িখানা ঝিরঝির বৃষ্টিতেও বেশ ভিজে গেছে বাস-স্টপ থেকে এতখানি হেঁটে আসতে আসতে। মাথার চুল ভিজে।

আশঙ্কা করেছিল বাড়ি ঢুকতেই মা আবার বলে বসবে, তুই একটা ছাতা কেন্ গৌরী, ভিজে ভিজে শেষে অসুখে পড়বি। কিন্তু ছাতা কেনা তো বড় কথা নয়, কে রোজ রোজ ওটা বয়ে নিয়ে যাবে!

না। মা কিছু বললো না, শুধু অঞ্জু ফুর্তিতে ছটফট করতে করতে বললে, কে এসেছে জানো?

—কে?

—জামাইবাবু।

দিদি এসেছে সেটা আর বললে না। গৌরীর হাসি পেলো ফ্রক-পরা মেয়েটার বেণী দোলানো আনন্দ দেখে।

এদিকে হিমানীশকে তখন ঘিরে বসেছে সকলে। গীতা, গায়ত্রী, আরতি আর গঙ্গা। গঙ্গার কোল থেকে বাচ্চুকে কেড়ে নিয়ে আরতি ছুটে এলো।—দ্যাখো দ্যাখো মেজদি, বাচ্চুটা একেবারে এক

নম্বরের কিচ্ছু হয়ে গেছে। কেমন হাসবে দেখো দাঁত বের করে—একটা দাঁত উঠেছে তো!

বলেই তাকে হাসাবার চেষ্টা করলো আরতি, আর অঞ্জু তাকে কেড়ে নিতে গেল। হুটোপুটি শুরু হলো দু'জনে।

গৌরী মৃদু হেসে একবার হিমানীশ, একবার দিদির দিকে তাকিয়ে পাশের ঘরে চলে গেল কাপড় বদ্‌লে আসতে।

ফিরে এসে দেখলে কাগজ কলম নিয়ে হিসেব কষতে শুরু করেছে হিমানীশ।

গৌরী হেসে বললে, কি ব্যাপার, লিস্ট করছেন কিসের? বাচ্চুর বিয়ে নাকি?

হিমানীশ বললে, না হে না, আমার শ্রাদ্ধ।

গঙ্গা চোখ পাকালো হিমানীশের দিকে তাকিয়ে।

আর সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে হিমানীশ বললে, বাস ভাড়ার পর সাতটা টিকিট, তারপর মিঠে পান, পটাটো চিপস্...

গৌরী হেসে বললো, সাতটা কেন? আমি যাচ্ছি না। আপনার পয়সায় আমি সিনেমা দেখবো না মশাই, দেখবো না।

হিমানীশ হেসে উঠে বললে, তা হলে তুমিই দেখাও। চাকরি হলো, তোমারই তো সিনেমা দেখানোর কথা।

এক কথাতেই রাজি হয়ে গেল গৌরী। মনটা এমনিতেই তার খুশী-খুশী ছিল। বলে বসলো, বেশ তাই।

আর গঙ্গা গীতাকে বললে, হ্যাঁ রে, তোর জামাইবাবুকে এক কাপ চা করে দিবি না?

কথাটা বলতে না বলতেই সবাই সশব্দে হেসে উঠলো।

আর গঙ্গা উপহাসটুকু গায়ে না মেখে গৌরীকে বারান্দায় ডেকে নিয়ে গেল।

তারপর গম্ভীর গলায় প্রশ্ন করলে, হ্যাঁ, রে, কি করবি কিছু ঠিক করলি? তোর জামাইবাবু বলছিল একটা কিছু করে ফেলাই ভালো।

গৌরী মাথা নিচু করে রইলো। কোনো উত্তর দিলো না

অসীমাভকে সরল মনেই উত্তর দিয়েছিল গৌরী। বলেছিল, বেশ তো, যাবো একদিন।

কিন্তু তারপর প্রায়ই যখন সে-কথাটা মনে পড়িয়ে দিতে শুরু করলো অসীমাভ, তখন অস্বস্তি বোধ না করে পারলো না ও। না কি গৌরীর মনে অসীমাভ সত্যিই একটা স্থান জুড়ে বসেছে তখন? তা না হলে, আপিসের আর সকলে—ভারতীদি বা মন্দিরা ঠাট্টাবিদ্রূপ করলে হেসে উড়িয়ে দিতো যে গৌরী সে কেন সমস্ত ব্যাপারটা তাদের কাছ থেকে গোপন রাখতে চাইলো!

সেদিন কোন্ এক হাফ-মন্ত্রী মারা গেছেন। তাই দেড়টার সময় আপিস ছুটি হয়ে গেল।

অসীমাভ বললে, আজ চলুন।

এক মুহূর্ত কি যেন ভাবলে গৌরী, হয়তো এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করলে। কিছু একটা অজুহাত খুঁজতে চাইলো, পারলো না।

শেষে বাধ্য হয়েই বললে, ঠিক আছে। আপনি চলুন, বাস-স্টপে দাঁড়াবেন যান, আমি আসছি।

কথাটা বলতে গিয়ে এদিক-ওদিক তাকিয়ে দেখে নিলো। তারপর অসীমাভ বেরিয়ে যেতেই মন্দিরাদের কাছে এসে দাঁড়ালো।

মন্দিরা ভারতীদি উমা নাগ—তখন কোন সিনেমায় যাওয়া যায় তার জল্পনাকল্পনায় মেতে আছে।

মন্দিরা গৌরীকে দেখতে পেয়েই বললে, এই চলো সিনেমা দেখতে যাচ্ছি আমরা।

গৌরী বিপদে পড়লো। তবু বললে, না ভাই আমার একটু কাজ আছে।

—কাজ ? হাসলো মন্দিরা।

হাসিটা ভালো লাগলো না গৌরীর। অপ্রতিভ গলায় বললে, না, না, সত্যি বাড়ির কাজ আছে, কোনোদিন তো ছুটি পাই না দুপুরে···

বলে বেরিয়ে চলে এলো। সিঁড়ি বেয়ে নিচে নেমে এসে অসীমাভকে খুঁজলে।

তারপর এক সময় ভিড় ঠেলে বাসে উঠলো দু'জনে। গৌরী বসতে পেলো, অসীমাভ পেলো না। তাকে রড ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে ঠোঁট টিপে হাসলো গৌরী। তারপর জানালায় মুখ রেখে বাইরের দিকে তাকিয়ে রইলো।

কি আশ্চর্য! এমন কিছু অন্যায় তো করছে না গৌরী, এমন কিছু লজ্জা পাবার মতো কাণ্ড নয়। তবু মন্দিরাদের কাছে ব্যাপারটা গোপন রাখতে চাইলো কেন ?

মন্দিরা যদি জানতে পারে, ভারতীদি যদি শুনতে পান, তাহলে কি-না-কি ভেবে বসবে ওরা।

অথচ গৌরী নিজে তো জানে···

বাইরে থেকে দেখে বুঝতে পারে নি গৌরী। ভাবতে পারে নি বাড়ির ভেতরটা এত সুন্দর।

ছোট ছোট তিনখানি ঘর, একফালি বারান্দা। কিন্তু কেমন একটা নিশ্চিন্ত বিশ্রাম যেন স্থির হয়ে আছে। আসবাবপত্রের বাহুল্য নেই, তাই একটা সুন্দর পরিচ্ছন্নতার প্রলেপ ঘরগুলির সর্বাঙ্গে।

দিদির সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিলো অসীমাভ। আর গৌরীর মনটা হঠাৎ যেন খুশী হয়ে উঠলো। ঠিক এই চেহারা যেন ও আশা করে নি। ভেবেছে একটা বিষণ্ণতার রূপ নিয়ে দেখা দেবে।

একখানা কালোপাড় সাদা শাড়িতে বড় সুন্দর দেখালো অমিতাকে। আঁটসাঁট ফর্সা চেহারা, মুখে উজ্জ্বল হাসি।

গৌরী দু' হাত তুলে নমস্কার করলে, অমিতা খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, আমার ভাই ওসব আসে না।

বলে হাত ধরে গৌরীকে ঘরের ভিতর ডেকে নিয়ে গেল।

কমলা রঙের চাদর পাতা ছিমছাম বিছানা খাটের ওপর। এক পাশে একটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে ঘুমোচ্ছে।

গৌরী মৃদু হেসে খাটের ওপরই বসলো, তারপর বাচ্চা ছেলেটার ঘুমন্ত মুখে চোখে গালের ওপর হাত বুলিয়ে দিয়ে ধীর স্বরে বললে, ঠিক আমার দিদির ছেলের মতো! কি সুন্দর যে লাগছে!

অসীমাভ ওকে দিদির কাছে বসিয়ে দিয়েই বোধহয় বাইরে বেরিয়ে গেছে। একটু সন্দেহ হয়েছিল গৌরীর, অসীমাভ নিশ্চয় ওর জন্যে কোনো খাবারটাবার কিনতে যাচ্ছে। বুঝতে পেরেও বাধা দিতে পারে নি। যদি সত্যিই তা না হয়।

একটু পরেই ফিরলো অসীমাভ, এসে দেখলে খাটের ওপর পা গুটিয়ে সামনাসামনি বসেছে দু'জনে, আর দিদির মেয়ে রিনা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে গৌরীর কোল ঘেঁষে। কথায় কথায় দু'জনেই ফুর্তিতে হেসে উঠছে।

অসীমাভ মৃদু হেসে বললে, বাঃ এর মধ্যে দু'জনে বেশ জমে গেছ তো?

অমিতা হাসলো।—তোদের মতো অত নমস্কার ধন্যবাদ আমরা পারি না বাপু। মনের মতো লোক পেলে মন খুলে কথা বলি।

গৌরী ঠোঁট টিপে হাসলো। কোনো কথা বললে না। তারপর অমিতা চা করতে উঠে যেতেই ও খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে ঘর ক'খানা দেখলে। মুখে এক কথা।—কি সুন্দর যে লাগছে!

সত্যি, এত সুন্দর ছিমছাম বাড়ি খুব কম দেখেছে ও। আর এমন একটা হাসিখুশি শান্তির পরিবার। মুহূর্তের জন্যে গৌরীর মনে অকারণেই আরেকটা সংসারের ছবি ভেসে উঠলো, আরেকটি সংসারের মানুষদের ছবি। রঞ্জিতের মা-বাবা-বোন।

সত্যিই কি তার মা-বাবাকে আপন করে নিতে পারে নি গৌরী?

না-কি রুচির পার্থক্যই তার মনকে বিরূপ করে তুলছিল বিয়ের পরের সেই দিনগুলিতে!

রিনাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুরে ঘুরে প্রতিটি ঘর দেখলে গৌরী। অসীমাভর ঘরে হয়তো একটু বেশীক্ষণ দাঁড়ালো। একটি ছোট্ট টেবিল, টেবিলে টাইমপীস, ক'খানা বই, টুকিটাকি আরো দু'চারটি জিনিস।

টেবিলের ওপর থেকে একখানা বই তুলে নিলো, তারপর চমকে উঠলো।—সে কি, আপনি কবিতা পড়েন?

অসীমাভ লাজুক হাসি হাসলো।

বইখানা নামিয়ে রেখে গৌরী আবার বললে, সত্যি এখানে এসে আজ কি ভালো যে লাগছে!

অসীমাভ যেন আরো লজ্জা পেলো সে-কথায়। আর গৌরী রিনার সঙ্গে গল্প করতে করতে রান্নাঘরে এসে অমিতার সামনে বসতে গেল।

রিনা তাড়াতাড়ি একটা আসন পেতে দিলো।

গৌরী বসলো আসনের ওপর, সঙ্গে সঙ্গে বললে, নমস্কার করেছিলাম বলে খুব তো খোঁটা দিলেন দিদি, এও কিন্তু তাই।

অর্থাৎ আসন পেতে দেওয়া।

রিনা বাধা দিলো।—রাঃ রে, শাড়িটা নোংরা হবে বলেই তো দিলাম।

প্লেটে খাবার সাজাতে সাজাতে অমিতা বললে, অসীম কি বলে জানো? আমাকে বলে নার্সিং শিখে চাকরি করতে।

গৌরী হেসে বললে, ঠিকই তো বলেন।

—তুমিও বলছো? সত্যি বলো, মেয়েদের চাকরি করতে ভালো লাগে?

গৌরী হেসে উঠলো।—ভালো না লাগলে করছি কেন?

—তোমাদের কথা ভাই অন্য, আমাদের মতো যারা জীবন শেষ করে এসেছে···

একটা মুহূর্তের জন্যে থমকে রইলো গৌরী। একটি মুহূর্তের জন্যে ওর ইচ্ছে হলো, হঠাৎ বলে ওঠে, আমিও তো জীবন শেষ করেই এসেছি দিদি!

সমস্ত গোপনতাকে অসীমাভর সামনে মেলে ধরবার এমন একটা সুযোগ পেয়েও ক্ষণিকের জন্যে স্তব্ধ হয়ে রইলো গৌরী। সমস্ত ছেলেমানুষি, সব অভিনয় শেষ করে দেবার এমন সুযোগ আর পাবে না ও।

তবু, হঠাৎ মনে হলো, কথাটা শুনে হয়তো অসীমাভর উজ্জ্বল আনন্দের মুখ ম্লান হয়ে যাবে। সেই ম্লান দীনতার ছায়া কি সহ্য করতে পারবে গৌরী?

না, গৌরী শুধু বলে উঠলো, জীবন কার কোত্থেকে শুরু হয়, কোনটা শেষ কেউ কি বলতে পারে!

অসীমাভ পিছনে দাঁড়িয়ে শুনছিল। মৃদু হেসে গম্ভীর গলায় বললে, বি-এতে ফিলজফিতে অনার্স ছিল বুঝি আপনার?

তিনজনই এবার হোহো করে একই সঙ্গে হেসে উঠলো।

আরো অনেকক্ষণ সেখানে কাটিয়ে সন্ধ্যের সময় বিদায় নিলো গৌরী।

কথা দিলো।—আবার আসবো! আসবো নিশ্চয়ই।

শুধু ইচ্ছে থাকলেও বলতে পারলো না, আপনিও একদিন চলুন আমাদের বাড়িতে।

বলতে বাধলো। যদি সত্যিই একদিন গিয়ে হাজির হয় অসীমাভর দিদি! যদি গীতা গায়ত্রীর সঙ্গে, কিংবা মার সঙ্গে গল্প করতে করতে কোনো সময় শুনতে পায় গৌরীর ফেলে-আসা জীবনের ইতিহাসটুকু—না, না, তা হ'লে লজ্জায় মুখ দেখাতে পারবে না ও। শুধু অসীমাভ নয়, আপিসের কারও সামনেই চোখ তুলে তাকাতে পারবে না।

মন্দিরার কথাটা, বাসে ফিরতে ফিরতে, একবার মনে পড়ে গেল

গৌরীর। নিজের মনেই কেমন যেন শঙ্কিত হয়ে উঠলো। মনে হলো, টিফিনের সময় চায়ের দোকানে বসে মন্দিরা আর ভারতীদি যেন আবার চাপা গলায় বলছে, গৌরী মেয়েটা কি সাংঘাতিক!

শুধু এই একটি আশঙ্কায় সারাটা দিনের সমস্ত আনন্দ যেন মুহূর্তে নিভে গেল।

গৌরী চলে যাবার পর দিদি এসে বসলো অসীমাভর সামনে।

রেডিও খুলে অসীমাভ তখন গান শুনছে। কিংবা ওর নিজের মনেও হয়তো একটা গানের সুর বাজছে। কেমন এক বিচিত্র আনন্দ জুড়ে আছে সমস্ত মন। একটা ফুরফুরে হাল্কা আমেজ।

কই, অন্য কোনোদিনই তো এমন অদ্ভুত অনুভূতি জাগে নি। এমন মুক্ত: বাসের ভ্যাপসা গুমোট দুর্গন্ধে ভরা ভিড় থেকে হঠাৎ নেমে পড়ার পর যেমন হঠাৎ ভালো লাগে প্রায় তেমনই। কাজ, দায়িত্ব, পরীক্ষা আর উচ্চাশার ভিড় থেকে বেরিয়ে এসে একটা বিকেলের বিশ্রাম, একটুকরো মেঘলা মুক্তি যেন অসীমাভকে নতুন মানুষ বানিয়ে দিয়ে গেছে। সারাদিন আপিসে কাটিয়ে আসার পর বাড়ি ফিরে যখন জুতো আর মোজা খুলে পায়ে ঠাণ্ডা বাতাস লাগে তখন যেমন সমস্ত মন জুড়িয়ে যায়, তেমনি এক দমকা বাতাসে অসীমাভর সারা শরীর জড়িয়ে আছে।

ছোট্ট টেবিলটার ওপর পা দুটো তুলে দিয়ে চেয়ারে হেলান দিয়ে হয়তো গানই শুনছিল অসীমাভ, কিংবা ভাবছিল। ভাবছিল অন্য কিছু।

দিদির পায়ের শব্দে ফিরে তাকালো। দিদি তাকালো ওর মুখের দিকে, মৃদু হেসে বললে, বেশ মেয়েটি। আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে।

অসীমাভ হাসলো। বললে, প্রথম দিন এমন লজ্জায় পড়েছিলাম।

দিদি হেসে বললে, সে তো শুনেছি। না জেনেশুনে তুই বা অমন অপমান করতে গিয়েছিলি কেন?

অসীমাভ হেসে বললে, কি করবো বলো, আপিসের যত কাজের চাপ যে আমার ওপর। যত ভুলের বোঝা আমাকে বইতে হয়। মন মেজাজ কি ঠিক থাকে সব সময়।

দিদি হাসলো।—অত কাজ করতে যাস কেন?

—বাঃ রে, না করলে কে করবে সব!

—আরও তো লোক আছে।

অসীমাভ হাসলো।—আপিসের নিয়ম যে অন্য। যে কাজ জানে, যে দায়িত্ব নেয় সব ভার তার ওপরই এসে পড়ে।

দিদি হেসে বললে, যাই বলিস, গৌরীকে আমার কিন্তু খুব ভালো লেগেছে, ভারী মিশুকে, আর বেশ ঠাণ্ডা প্রকৃতির।

অসীমাভ হেসে বললে, তবেই দেখো, সেও চাকরি করছে, আর ঐ তো বয়েস। অথচ তুমি···

—না রে, ওকে দেখে চাকরির ভয় আমার চলে গেছে।

অসীমাভ শুনে খুশী হলো।

ইতিমধ্যে রিনা এসে দাঁড়িয়েছে ওর কাছে। রিনাকে কাছে টেনে নিয়ে অসীমাভ হেসে বললে, তুমি নার্সিং পাস করো, আর রিনা ডাক্তার হবে, তারপর দু'জনে···

রিনা হেসে উঠলো। —না ছোটমামু, মড়া কাটাটাটা আমার মোটেই ভালো লাগে না।

অসীমাভ হেসে উঠলো। —তবে কি হবি তুই?

—ইঞ্জিনিয়ার।

—ইঞ্জিনিয়ার? চোখ কপালে তুললো অসীমাভ। বললে, তা হ'লে চেহারাটা আগে ভালো করতে হবে। এমন হাড়-টিমটিম চেহারায় তো···

—তুমি কি বলো তো ছোটমামু। প্রতিবাদে চোখ পাকালো

রিনা। —আমি নয় একটু রোগাই, তা ব'লে রোগারা কি কিছুই করতে পারে না!

রিনার মা ধমক দিলে।—পারে না তো। এত করে বলি, একটু খাওয়াদাওয়া কর···

রিনা মুখ বাঁকালে। —তোমাদের ঐ এক কথা, রোগা হলে বিয়ে হবে না, রোগা হলে ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যাবে না, রোগা হলে চাকরি করা যাবে না······কেন গৌরীমাসী তো···

অসীমাভ আর অমিতা হেসে উঠলো ওর কথায়।

অসীমাভ হেসে বললে, ও কি রোগা নাকি, ও তো স্লিম।

রিনা মাথা ঝাঁকালে, ঠোঁট বাঁকালে। বললে, বাড়ির লোক হলে যাকে রোগা বলে, বাইরের হলেই তাকে স্লিম বলে।

এবারও ওরা হু'জনেই হেসে উঠলো। আর রিনা ছুটে পালালো সেখান থেকে।

রিনা চলে যেতেই দিদির প্রশ্নটা কানে এলো। —হ্যাঁ রে, বাড়িতে কে কে আছে ওর?

—গৌরীর? অসীমাভ ফিরে তাকালো, চেয়ার থেকে মাথাটা ঘুরিয়ে।

দিদি মাথা নাড়লো।

এই প্রথম অসীমাভর মনেও প্রশ্নটা জাগলো। —তা তো জানি না।

—সে কি রে? হেসে লুটিয়ে পড়লো দিদি, —কে কে আছে, বাপ মা ভাইবোন আছে কিনা তাও জিগ্যেস করিস নি?

—না।

—ও মা, কি ছেলেরে তুই!

অসীমাভ হেসে বললে, কারণ নেই কিছু নেই, হঠাৎ জিগ্যেস করবো কেন?

—কেন ? ঠোঁট উল্টে ভেংচি কাটলো দিদি। —জানতে ইচ্ছে হয় নি তোর ?

—না তো !

দিদি হেসে বললে, আমি তা হলে কি করে জিগ্যেস করলাম ?

ও, দিদি তা হলে সবই জেনেছে। শুধু যাচিয়ে দেখে নিতে চায় অসীমাভ জানে কি না। দিদি কি তবে, এই পরিচয়ের মধ্যে, গৌরীর এই নিছক বেড়াতে আসার মধ্যে, অন্য কোনো অর্থ খুঁজেছে ?

অসীমাভর হাসি পেলো সে কথাটা মনে হতেই। অথচ ঔৎসুক্যও জাগলো। তাই প্রশ্ন করলে, কি বললে ও ?

—বললে, বাপ মা আছে, এক ভাই আছে।

—ও।

—আর ছ' বোন ওরা।

অসীমাভ হেসে উঠলো। —হাফ এ ডজন।

দিদি হঠাৎ বলে বসলো, তুই ওকে বিয়ে কর অসীম, খুব ভালো মেয়ে ও, কি মিষ্টি ব্যবহার !

কথাটা শুনেই চেয়ার ছেড়ে তিড়িং করে উঠে দাঁড়ালো অসীমাভ। একটু যেন ক্রুদ্ধ বিরক্ত দেখালো ওকে।

ধীরে ধীরে বললে, এ-সব কথা তুমি ওকে কিছু বলেছো নাকি !

দিদি হাসলো। উত্তর দিলো না।

—ছি ছি ছি। লজ্জায় অসীমাভর মুখ ফ্যাকাশে হয়ে গেল। একটা আতঙ্কের ছাপ পড়লো ওর মুখেচোখে।

রাগতঃ স্বরে বললে, ছি ছি, কি কাণ্ড করেছো তুমি !

দিদি তখনও হাসছে। বললে, ছাখ অসীম, মেয়েদের চোখকে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তুই ভেবেছিস আমি কিচ্ছু বুঝি না !

অসীমাভর চোখ তখনও বিস্ময়ে বিস্ফারিত। ধীরে ধীরে বললে, কি বুঝেছো ?

দিদি অর্থপূর্ণ হাসি হাসলো।—ও বললে, ওর দিদির বিয়ে হয়েছে, একটা ছোট্ট ছেলে আছে।

—তা থাকলেই বা। বিরক্ত দেখালো অসীমাভকে।

—তারপর ঠাট্টা করে জিগ্যেস করলাম, তোমার বিয়ে কবে? বলতেই গৌরী কেমন চুপ করে গেল, লজ্জা পেলো, লজ্জায় মাথা নিচু করলে, কোনো উত্তর দিলে না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে অসীমাভ বললে, কি ভাববে বলো তো। আপিসের একটা মেয়েকে ডেকে এনে বিয়ের কথা জিগ্যেস করলে লজ্জা পাবে না?

দিদি ঠোঁট টিপে হাসলো। বললে, দ্যাখ অসীম, আমি সব বুঝি। আপিসের মেয়ে আপিসের মেয়ে বলিস না। কোনো সম্পর্ক নেই তোদের, অথচ, তুই বাড়িতে আসতে বললি আর সে এলো?

অসীমাভ কোনো উত্তর দিলো না। দিদিকে কি বোঝাবে সে। বাইরের পৃথিবীটা যে আজকাল বদলে গেছে, দিদির সেই পনেরো বছরে বিয়ে হওয়ার দিনগুলোর রীতিনীতি যে উল্টে গেছে, এমন সামান্য একটা ব্যাপারের যে কোনো গভীর অর্থ নেই, এ-কথা দিদি বুঝবে না।

তাই আর কোনো আলোচনাই করলো না অসীমাভ। তবু সমস্ত রাত, যতক্ষণ না ঘুম এসেছে, কেমন একটা লজ্জা আর আতঙ্কের মধ্যে কেটে গেল। ছি ছি, কি ভেবেছে গৌরী? দিদি হয়তো ভুল বুঝে অনেক আজেবাজে কথা বলে গেছে।

গৌরী কি ভাববে! ও হয়তো ভেবেছে, দিদির কাছে ওকে নিয়ে অসীমাভ নিজেই এ-সব গল্প করেছে। হয়তো ভেবেছে, নিজের মুখে বলতে সাহস পায় নি বলেই দিদিকে দিয়ে ঘটকালি করতে চেয়েছে।

পরের দিন তাই আপিসে এসেও মুখ তুলে ও গৌরীর দিকে তাকাতে দ্বিধা বোধ করলো।

কি এক অদ্ভুত ভয় আর লজ্জা!

হয়তো দিদির সে-সব কথা শুনে অসীমাভকে এবার থেকে এড়িয়ে যেতে চাইবে গৌরী। হয়তো···

মন্দিরা, ভারতীদি বা অন্য সকলের কাছে হয়তো হাসতে হাসতে সব কথা প্রকাশ করে বলবে। হয়তো বলবে, ওই উদ্দেশ্য নিয়েই বাড়িতে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিল অসীমাভ।

কিন্তু না, টিফিনের সময় হাসতে হাসতে গৌরী এগিয়ে এলো অসীমাভর কাছে। তারপর একখানা চেয়ার টেনে নিয়ে তার সামনে বসে পড়ে ধীরে ধীরে বললে, আপনার দিদিকে সত্যি এত ভালো লাগলো!

অসীমাভর মনে হলো কথাটা যেন গৌরী একটু চাপা গলায় বললে। শুধু এই চাপা গলার স্বরটুকুর মধ্যে কি যেন অর্থ আছে বলে সন্দেহ হলো।

হয়তো আপিসের আর সকলের কাছে ঘটনাটা গোপন রাখতে চায় গৌরী। তার বেশী কিছু নয়।

ঠিক এমন হবে গৌরী ভাবতে পারে নি। অসীমাভকে তার ভালো লেগেছিল। হয়তো আর সকলের থেকে তাকে পৃথক করে দেখতো। কিন্তু—

অসীমাভ কি ভুল বুঝলো? না কি মনের সুপ্ত অনুরাগটুকুকেই কল্পনার জাল বুনে ধীরে ধীরে রাঙিয়ে তুলতে চাইলো।

দিদি বললে, তুই আমার চোখকে ফাঁকি দিতে পারবি না অসীম।

কথাটা বুকের মধ্যে গিয়ে লাগলো। তবে কি সত্যিই গৌরীর মনে কোনো দুর্বলতা আছে অসীম সম্পর্কে? তা না হলে দিদি একথা

কেন বলবে ? অসীম ভাবলে, সে যা বুঝতে পারে নি দিদির চোখে তা সহজেই হয়তো ধরা পড়ে গেছে।

প্রতিটি দিনের কথাবার্তা, গৌরীর হাসি, তার ঈষৎ স্পর্শের রোমাঞ্চ—সব কিছু রোমন্থন করে যেন অদ্ভুত একটা আনন্দ পেতে শুরু করলো অসীমাভ। সব কিছুর মধ্যেই যেন প্রেমের অস্পষ্ট ইশারা দেখতে পেলো।

গৌরী নিজেও লক্ষ্য করলো, আগের মতো আর ফাইলপত্র নিয়ে ছুটির পরেও বসে থাকে না অসীমাভ। গৌরীকে কাগজপত্র গুটিয়ে রাখতে দেখলেই সেও সবকিছু দেরাজে তুলে রাখতে শুরু করে। তারপর গৌরী হাসিমুখে কাছে এসে দাঁড়াতে না দাঁড়াতেই উঠে পড়ে অসীমাভ।

বেরিয়ে আসে দু'জনে ফাঁকা রাস্তায়।

অসীমাভর গলার স্বর ক্রমশ গাঢ় হয়ে আসে, কখনো কখনো তার কথা শুনে মনে হয় যেন আবেগে তার বুকের ভেতরটা কেঁপে উঠতে চাইছে।

ভালো লাগতো গৌরীর, কখনো কখনো সন্দেহ হতো ও নিজেও হয়তো ভালোবেসে ফেলেছে অসীমাভকে। বাড়ি ফিরে চুপ করে বারান্দায় বসে থাকে কেন, রাতে ঘুম আসে না কেন। কেন বার বার অসীমাভর কথা মনে পড়ে।

নিজের মনেই কখনো হেসে উড়িয়ে দেয় গৌরী, কখনো নিজেই নিজেকে ভয় পায়।

কয়েকদিন ধরেই অসীমাভর কথাবার্তায়, তার চোখের দৃষ্টিতে পরিবর্তন লক্ষ্য করেছে গৌরী। দেখেছে কাজের ফাঁকেও যে-কোনো অজুহাতে তার কাছে আসতে পেলেই যেন অসীমাভর দু'চোখ উজ্জ্বল হয়ে ওঠে।

কিন্তু, কিন্তু গৌরীর মনের ভিতরে যাই থাক, তার জীবনের একটি দুর্ঘটনার মধ্যেই যে রয়েছে এক প্রচণ্ড বাধা।

রঞ্জিতের কথা মনে পড়লেই সব ইচ্ছার আলো দপ্ করে নিভে যেতে চায়।

না, এভাবে অভিনয় করে চলতে পারবে না গৌরী। একটা প্রচণ্ড ক্রোধ, এক অসহ্য জ্বালা!

বাড়ির বারান্দায় বসে/ছিল গৌরী, রেলিঙের ধারের শুকিয়ে যাওয়া গাছটার টবে পা রেখে। রাত ঘন হয়ে আসছে। টুং টুং করে একটা রিকশা চলে গেল। নিভে যাওয়া লাইটপোস্টের নিচে বস্তির লোকগুলো দড়ির খাটিয়ায় বসে গলা ছেড়ে গান গাইছে ঢোলক বাজিয়ে।

কি ফুর্তি লোকগুলোর মনে। অথচ গৌরীর মনে অসহ্য এক যন্ত্রণা। রঞ্জিৎ।

রঞ্জিতের কথা, তার জীবনের গোপন ব্যর্থতার কথাটা অসীমাভর কাছে গোপন রেখে কি ভুলই না করেছে সে।

সব আনন্দের মধ্যে ওই একটাই কাঁটা বারি বার বুকের মধ্যে খচখচ করে লাগে।

কি করবে গৌরী, কি ভাবে সেই গোপন ইতিহাস অসীমাভর সামনে মেলে ধরবে খুঁজে পায় না।

অথচ, অথচ এই একটি কথা গোপন না করলে হয়তো আজ নতুন পথে যাত্রা শুরু করতে ভয় পেত না গৌরী। হয়তো অসীমাভর প্রেম এই ঘটনাটুকুকে হেসে উড়িয়ে দিতে পারতো।

ভাবনার সুতোটা হঠাৎ ছিঁড়ে গেল, একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো গৌরীর বুক নিঙড়ে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো গৌরী। ঘরের টেবিল লাইটের আলোটা এসে পড়েছে বারান্দায়। শ্যামল বইয়ের পাতায় মুখ গুঁজে পড়ছে। গীতা হয়তো বইয়ের পাতা খুলে রেখে রাস্তার ওপারের বাড়িটার জানালায় চোখ এঁটে বসে আছে। ওর কোনো ভাবনা নেই, কোনো ভয় নেই। জীবনে গোপন করবার মতো কোনো কিছুই যে নেই ওর।

রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে অধৈর্য হয়ে উঠছে যেন গৌরী। একটা অস্বস্তিতে সর্বাঙ্গ কাঁপছে থরথর করে।

রাত্তিরে বিছানায় শুয়ে শুয়েও ওই একই চিন্তা। ঘুম আসে না, ঘুম আসে না।

কখন রাত কেটে যাবে, সকাল হবে তার জন্যেই যেন অধৈর্য হয়ে ওঠে গৌরী।

হ্যাঁ, মনস্থির করে ফেলেছে। এই জ্বালা থেকে নিস্তার পেতে চায় ও।

মনে মনে কথাগুলো গুছিয়ে নিতে চায়, কি ভাবে প্রকাশ করে বলবে অসীমাভকে।

সে-কথা ভাবতে ভাবতেই পরের দিন সকালে আপিস বের হতে যাচ্ছিল গৌরী।

আর তখনই গায়ত্রী ছুটতে ছুটতে এলো।—মেজদি, তোর চিঠি!

হাত বাড়িয়ে চিঠিখানা নিলো গৌরী, হাত কেঁপে উঠলো ঠিকানাটার দিকে তাকিয়েই।

খামটা না খুলেই রাস্তায় বেরিয়ে পড়লো গৌরী, তারপর গলির মোড়ে পৌঁছে কাঁপা কাঁপা হাতে চিঠিখানা খুললো।

ঠিকানায় রঞ্জিতের হাতের লেখাটা দেখেই অকারণ ক্রোধে জ্বলে উঠতে চেয়েছিল গৌরী, চিঠিটা পড়ে কেমন যেন একটা আতঙ্ক বোধ করলো।

দেখা করতে চেয়েছে রঞ্জিৎ, শুধু কয়েকটা কথা বলতে চেয়েছে।

কথা তো ফুরিয়ে গেছে রঞ্জিতের সঙ্গে, আর কোনো কথা নেই। তবু তাকে রাহুর মতো অনুসরণ করে চলেছে কেন সে!

আপিসে পৌঁছে নিজের চেয়ারে বসে একবার অসীমাভর দিকে তাকালো গৌরী, অসীমাভও সেই মুহূর্তে তার দিকে তাকালো, হাসলো।

গৌরী ভাবলো এক মুহূর্ত।

যাবে ও এখনই ? গিয়ে বসবে অসীমাভর সামনে ! বলবে তার গোপন ইতিহাসটুকু ?

কিন্তু কি ভাবে বলবে, খুঁজে পেলো না গৌরী। সারা সন্ধ্যা, সারা রাত ধরে মনস্থির করেছে ও। অধৈর্য হয়েছে কখন সকাল হবে, আপিসে পৌঁছে অসীমাভর সঙ্গে দেখা হবে তার। বলবে। কিন্তু সামনে এসে পৌঁছে কথা খুঁজে পেলো না।

রঞ্জিতের চিঠিটাই কি হাসতে হাসতে তুলে দেবে অসীমাভর হাতে?

তাই ভালো।

অসীমাভর টেবিলের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো ও। চিঠিখানা হাতেই রইলো।

অসীমাভ কি হেসে প্রশ্ন করবে না, কার চিঠি ? তা হ'লে তো চিঠিটা তার হাতে তুলে দিতে পারে ও।

না, অসীমাভ সে-প্রশ্ন করলো না। শুধু বললে, আপনাকে আজ বড় চিন্তিত দেখাচ্ছে।

—কই না ! আর কি বলবে ও।

চিঠিখানা কি নিজেই তুলে দেবে ও অসীমাভর হাতে ?

দিতো হয়তো, কিন্তু তার আগেই হাসতে হাসতে এগিয়ে এলো ভারতীদি।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে দু'জনের মুখের দিকে হাসি হাসি চোখে তাকিয়ে গৌরীর হাত থেকে চিঠিখানা কেড়ে নিলো।—প্রেমপত্র বুঝি।

আতঙ্কে মুখ সাদা হয়ে গেল গৌরীর।

ভারতীদি ততক্ষণে চিঠিখানা পড়ে ফেলেছে। ছোট্ট দু'লাইনের চিঠি।

তারপর হেসে উঠে বললে, আহা বেচারী দেখা করতে চায়. দেখা করিস গৌরী। পাড়ার ছেলে বুঝি ?

তরতর করে যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো গৌরীর। ক্ষীণ কণ্ঠে শুধু বলতে পারলো, হবে হয়তো।

রঞ্জিৎ ভেবেছিল, ও নিজেই গিয়ে দেখা করবে গৌরীর সঙ্গে। কিন্তু লজ্জায় পেরে ওঠে নি।

গৌরী চলে গেছে, আর সে চলে যাওয়ার পরই যেন নিজের কাছে ছোট হয়ে গেছে রঞ্জিৎ। এক অসীম লজ্জা।

প্রথম প্রথম মা-বাবা ছোটবোনের কাছে, বন্ধুবান্ধবদের কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছে খবরটা। কিন্তু ব্যাপারটা যে তুচ্ছ নয়, জানতে কারো বাকী রইল না!

অথচ অপরাধ তো গৌরীর নয়।

কাছাকাছি থাকলেই নাকি মানুষে মানুষে দূরত্বটা বেড়ে যায়। তা না হলে বাবা-মার সঙ্গে এতদিনের আজীবন সম্পর্ককে ভাঙা হাঁড়ির মতো ফেলে আসতে পারলো কি করে রঞ্জিৎ?

দোষ ওর নিজেরই, আজ আর বুঝতে অসুবিধে হয় না। না কি বাবা-মা ছোটবোনের?

আসলে রঞ্জিতের স্বপ্নের সঙ্গে তাদের পরিবারটা মানিয়ে চলতে চায় নি। তা না হলে এত ছোটখাটো ব্যাপার এমন বিরাট আকার নেবে কেন?

গৌরীকে নিয়ে পরিপূর্ণ সুখী হতে চেয়েছিল রঞ্জিৎ। হতে পারে নি। আর তাই প্রতিটি পদক্ষেপেই মনে হয়েছে তাদের সংসারের অসুখী আবহাওয়াটাই সব সুখ কেড়ে নিচ্ছে। মনে হয়েছে, মা-বাবা সময়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে শেখে নি, চলতে পারে না।

ভিতরের একটা অসহ্য দাহ দিনে দিনে বুকের গভীরে জ্বালা ধরিয়েছে। তারপর রঞ্জিৎ ভেবেছে, এই অসুখী আবহাওয়া থেকে মুক্তি পেলেই সে শান্তি পাবে, গৌরী সুখী হবে।

তাই সামান্য একটা ক্যামেরা অ্যাসিসটেন্টের চাকরি পেয়ে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দিয়ে সরে এলো রঞ্জিৎ। রঞ্জিৎ আর গৌরী।

কিনে আনা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড টেবিলটার ওপর সুন্দর একটা ঢাকনি পেতে দিয়ে টুকিটাকি জিনিসে তখন ঘর সাজাতে শুরু করেছে গৌরী।

গলায় গুনগুন গান, লাজুক আনন্দের হাসি ছড়িয়ে দিয়ে বললে, এবার যখন খুশী বেড়াতে যেতে বলো, যাবো তোমার সঙ্গে।

আবার এক সময় বলে উঠলো, বাবা বাঁচলাম। রাতদিন আর গার্জেনি শুনতে হবে না।

মুক্তির আনন্দ তখন গৌরীর চোখেমুখে।

কিন্তু রঞ্জিৎ যেন ঠিক গৌরীর মতো খুশী হতে পারছে না। গৌরীর হাসির পিঠে একটা কৃত্রিম হাসি হাসলো বটে রঞ্জিৎ, কিন্তু বুকের ভিতর তখন একটা অসহ্য জ্বালা।

এক দাহ দূর করতে গিয়ে অন্য এক দাহ। এক আগুন থেকে সরে আসতে গিয়ে অন্য এক আগুন।

রাতারাতি যেন মানুষটাই বদলে গেছে। সব সময় একটা যন্ত্রণার, দুশ্চিন্তার, কিংবা গোপন কোনো বুকভাঙা আর্তনাদের ছাপ।

প্রথম প্রথম গৌরী বুঝতে পারতো না। ভাবতো, অল্প রোজগারে সংসার চালানোর দুশ্চিন্তা বুঝি। তাই হেসে হেসে বলতো, টাকার জন্যে ভেবো না, ও সব ঠিক হয়ে যাবে।

রঞ্জিৎ হাসতো, কিন্তু সে হাসিতে যেন প্রাণ নেই।

কি আশ্চর্য। বাবা-মার কাছে একই সংসারে থাকার সময় মুক্তি চেয়েছিল রঞ্জিৎ, স্বপ্ন দেখেছিল। কিন্তু সেই বাঁধনটা ছিঁড়ে চলে আসার ব্যথা যে এত প্রচণ্ড ভাবতে পারে নি। আগুন আর মানুষকে কতখানি পোড়াতে পারে, মনের আগুন তুষের আগুনের মতোই।

সেই পুরোনো বাড়ি, পুরোনো অভ্যাস ছেড়ে এসে সব উৎসাহ

নিভে গেল রঞ্জিতের। সব সময়েই মুষড়ে থাকে। ভালো ভাবে কথার উত্তর দিতেও ইচ্ছে হয় না গৌরীকে।

গৌরী মাঝে মাঝে প্রশ্ন করে, কি এত ভাবো বলো তো?

—কিছু না।

ওই এক কথা। অথচ কিছু না ভেবেও থাকতে পারে না রঞ্জিৎ।

প্রতি মুহূর্তেই নিজেকে অপরাধী মনে হয়। ইচ্ছে হয় বাবা-মার কাছে ছুটে যেতে।

গৌরী মাঝে মাঝে বলে, চলো ওবাড়ি থেকে ঘুরে আসি।

কোনোদিন বা রঞ্জিৎকে যেতে বলে। কেমন আছেন ওঁরা, যাও নি অনেকদিন। যাও না, দেখে এসো।

রঞ্জিৎ যায়। কিন্তু সেই পুরোনো সম্পর্কটা, সেই স্বাভাবিক মন যেন ফিরে আসতে চায় না। বাবা-মাও কি দূরে সরে যেতে চাইছে, এক একদিন সন্দেহ হয় রঞ্জিতের।

দু'পাঁচ মিনিট বড় জোর দু'চারটে দরকারী কথা, দু'একটা কুশল খবর। তারপরই পালিয়ে আসতে ইচ্ছে করে।

এ এক অসহ্য অবস্থা। যেখানে চিড় খেয়েছে সেখানে বুঝি আর জোড়া লাগানো যায় না। যা ভেঙেছে তাকে আর গড়ে তোলা যায় না। অথচ মনও এমন বিচিত্র জিনিস, ভাঙা জীবন, ব্যথার ইতিহাস ভুলে গিয়ে নতুন কিছু গড়ে তুলতে চায় না। বার বার সেখানেই ফিরে যেতে চায়।

একদিন বুঝি রঞ্জিৎকে খুশী করার জন্যেই, ওর গোপন মনের বেদনা বুঝতে পেরেই গৌরী বললে, ওঁদের জন্যে সত্যি বড় মন কেমন করে।

আর সঙ্গে সঙ্গে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো রঞ্জিতের বুক নিঙড়ে। বললে, তখন তো ভাবো নি সে-কথা?

—ভাবি নি!

হঠাৎ যেন একটা ঘা খেল গৌরী। তবে কি রঞ্জিৎ সমস্ত অপরাধের জন্য গৌরীকেই দায়ী করেছে মনে মনে!

তাই একটু উষ্মার কণ্ঠেই বললে, আমি নয়, তুমিই ভাবো নি।

এত কথা-কাটাকাটি, ঝগড়া-বিবাদ থেকে যে বিস্ফোরণটা হঠাৎ একদিন ঘটে গিয়েছিল, তা কি রঞ্জিতের দোষে! প্রতিদিনের অসন্তোষ কি গৌরীর মুখ থেকেই শুনতে হয় নি তাকে! রঞ্জিৎ শুধু একটুকরো নিশ্চিন্ত বিশ্রাম চেয়েছিল, একটু রঙিন স্বপ্ন। সেই স্বপ্নটাই ভেঙে খান খান করে দিতো গৌরী। অথচ—

—এতই যদি আমার দোষ মনে করো, ফিরে যাও। বাধা দেব না তোমাকে। একদিন বলে ফেললো গৌরী।

রঞ্জিৎ বিরক্ত হলো মনে মনে। যে ব্যথাটা গোপনে লালন করতে চায় ও, লুকিয়ে রাখতে চায়, সেটাকেই বার বার মনে করিয়ে দেয় কেন!

তাই কষ্টের হাসি হেসে প্রশ্ন করলে, আর তুমি?

—আমারও ফিরে যাবার জায়গা আছে।

না, এরপর আর কিছু বলে নি রঞ্জিৎ, চুপ করে গেছে।

তারপর হয়তো, হয়তো এই ব্যথা জুড়োবার জন্যেই, না কি স্টুডিওর পরিশ্রমকে হাল্কা করবার জন্যে কে জানে—একদিন সামান্য একটু—

স্টুডিওরই একজন সহকর্মী একটা 'বারে' নিয়ে গিয়েছিল ওকে।

—কি এত ভাবেন সদাসর্বদা? ও-সব ঝেড়ে ফেলুন মন থেকে, তা না হলে কাজ করতে পারবেন না।

হেসেছিল রঞ্জিৎ সে কথায়।—ভাবনাচিন্তা কি ইচ্ছে করলেই দূর করা যায়!

—যায়। বলে একটা গ্লাস এগিয়ে দিয়েছিল সে।

পীড়াপীড়িতে একটু মুখে ঠেকিয়েছিল রঞ্জিৎ। এমন কিছু পাপ

নয়, অনেকেই তো খায়। আর একটা দিনেই তো সে মানুষ বদলে যাচ্ছে না।

একদিন নয়, পরেও আবার একদিন তার গ্লাসে একটু বেশী পরিমাণেই আলাহরী ঢেলে দিয়েছিল।

আর, সেদিন সত্যিই বড় ভালো লেগেছিল রঞ্জিতের, মনে হয়েছিল, বুকের সমস্ত জ্বালা যেন নিভে গেছে, সব চিন্তার জাল ছিন্ন হয়ে গেছে।

কি আশ্চর্য, তার এই অধঃপতনের ধীর পদক্ষেপ যে দিনে দিনে গৌরী লক্ষ্য করে গেছে, বুঝতে পেরেছে, তবু না বোঝার ভান করেছে, কে জানতো।

আর দিনে দিনে গৌরীর বিরুদ্ধে তার সব আক্রোশ ভুলে যেতে চেষ্টা করেছে রঞ্জিৎ। পিছনের বাঁধনটা ছিঁড়ে আবার ব্যথা মুছে ফেলতে চেয়েছে। অথচ বুঝতে পারে নি, সে যতই গৌরীর কাছে যেতে চেয়েছে, গৌরী ততই দূরে সরে গেছে।

তারপর, তারপর হঠাৎ একদিন মনের সুপ্ত বিক্ষোভটা ফেটে পড়েছে। গৌরী চিৎকার করে বলে উঠেছে, তোমাকে ছুঁতেও আমার ঘৃণা হয়।

ঘৃণা! নেশাগ্রস্ত একটা নির্বোধ মানুষের অট্টহাস হেসে উঠেছে রঞ্জিৎ।

যাকে ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়া বলে তাই। রাত্রে বিছানায় এপাশ-ওপাশ করতে করতে সকালের ঘটনাটির কথাই বার বার মনে পড়ছিল গৌরীর।

নিজের নির্বুদ্ধিতার জন্যে নিজেরই লজ্জা হয়। কি বোকামিই না করেছে ও!

গৌরীর মনে পড়ে, ওর বিয়ের পরেই সেই প্রথম দিনগুলির কথা। সদ্য বিয়ে হয়েছে, মনের গভীরে একটা চাপা উল্লাস, আর গর্বও হয়তো। তাই সাজগোজ করতে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যখন সিঁথিতে সিঁদুর দিতো চিরুনির উল্টো পিঠ দিয়ে, তখন বেশ চওড়া করে টেনে দিতো সিঁদুরের রেখাটা। অথচ ভাগ্যের পরিহাসে আজ সেই দাগটাই লকোবার চেষ্টা করে চলেছে গৌরী। গর্বের গৌরবের চিহ্নটাই আজ বুঝি হয়ে দাঁড়িয়েছে কলঙ্কের চিহ্ন।

কিন্তু কি আশ্চর্য, এমন উদ্ভট খেয়াল কেন যে হয়েছিল ওর! অসীমাভকে যদি গোপন ইতিহাসটুকু প্রকাশ করে বলতেই চেয়েছিল, তাহলে ছুটির পর তো ওকে কোথাও কোনো রেস্তরাঁয় ডেকে নিয়ে যেতে পারতো, কিংবা কার্জন পার্কের ঘাসের সবুজে বসে গল্প করতে করতে বলতে পারতো—আমাকে ক্ষমা করবেন, একটা কথা বলতে পারি নি আমি। তারপর, বলতে পারতো ও যা বলতে চেয়েছিল। তার বদলে কিনা রঞ্জিতের চিঠিখানা হাতে নিয়ে দাঁড়িয়েছিল অসীমাভর কাছে।

ভারতীদির ঠাট্টাটা শুনে তখন উপভোগ করার মতো মন ছিল না। কিন্তু এখন বিছানায় শুয়ে শুয়ে এই নির্জন রাত্রে নিঃশব্দ একাকীত্বে সে-কথা মনে পড়তেই অন্ধকারের মধ্যেই হেসে ফেললো গৌরী।

তারপর চাপা গলায় ডাকলে, গীতা!

না, গীতা গায়ত্রী সকলেই ঘুমিয়ে পড়েছে, কেউ সাড়া দিলো না। জেগে থাকলে গীতার সঙ্গে দু-একটা কথা বলা যেত। এখনো বই খুলে জানালা দিয়ে ওপাশের বাড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকে কি না!

অন্য কথা ভাবার চেষ্টা করে গৌরী, কিন্তু ফিরে ফিরে কেবল অসীমাভর কথাই মনে পড়ছে কেন!

ও কি সত্যিই রঞ্জিতের কথাটা বলতে চায় অসীমাভকে? বলতে চেয়েছিল? তাহলে ভারতীদির ঠাট্টাটা শুনে সহজ উত্তরটা দিলো না কেন! কেন এড়িয়ে গেল!

আর ভারতীদি হাসতে হাসতে অন্য সকলকে যখন খবরটা দিতে গেল তখন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়ল কেন !

আতঙ্ক দূর হয়েছিল তখন, আর ক্ষণেকের জন্যে মনে হয়েছিল, কি ভুলই না করে ফেলতো আর একটু হলেই !

কিন্তু ভারতীদির ঠাট্টা শুনে গৌরীর মুখের দিকে তাকিয়েই কেমন যেন অপ্রতিভ হয়েছিল অসীমাভ। হঠাৎ রঙ হারিয়েছিল তার মুখ। একটা অপমানের চাবুক খেয়েছিল যেন। না কি ব্যর্থতার ব্যথা।

স্পষ্ট বুঝতে পারে নি গৌরী, কিন্তু এটুকু বুঝেছিল—অসীমাভ আঘাত পেয়েছে। হয়তো মনে মনে ভেবেছে, সত্যিই কারও প্রেমপত্র পেয়েছে গৌরী। কিংবা কল্পনা করে নিয়েছে গৌরীর জীবন অন্য কারো মনের স্পর্শ পেয়েছে।

তাই কোন ফাঁকে গৌরীকে না জানিয়ে ছুটি হওয়ার আগেই কখন অসীমাভ চলে গিয়েছিল। আর গৌরীর মনে পড়েছে, সারা দিন একটি কথাও বলতে পারে নি অসীমাভ, একবারও চোখ তুলে তাকায় নি তার দিকে।

অন্য দিন হয়তো এই দৃশ্যটা মনে পড়লে নিজের মনেই হাসতো গৌরী, আজ আর হাসতে পারছে না। শুধু একটা ব্যথা গুমরে উঠছে বুকের মধ্যে, একটা দুঃখ, অসীমাভকে না জেনে ব্যথা দেওয়ার জন্যে।

এ কি শুধুই করুণা, না কি তার নিজের মনেরই গোপন দুর্বলতা ?

গৌরীর হঠাৎ মনে হলো, ও সত্যিই বুঝি গোপনে গোপনে ভালোবেসে ফেলেছে অসীমাভকে। তা না হলে এখন কেন মনে হচ্ছে, অসীমাভর কাছে কথাটা স্পষ্ট করে না বলে ভালোই করেছে ?

তবে কি অসীমাভকে হারাবার ভয় ? যদি সব শুনে অসীমাভ তার কাছ থেকে দূরে সরে যায় এই আতঙ্ক ?

বিছানায় শুয়ে শুয়ে ছটফট করলো গৌরী। বুক ঠেলে একটা

দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। মনে মনে বললে, না, না, অসীমাভকে কিছুই বলতে পারবো না, বলবো না।

সকালে যখন ঘুম থেকে উঠলো, সারা শরীরে তখন যেন কোনো শক্তি নেই। একটা অজানা আতঙ্কের পাথর চেপে আছে বুকের ওপর। একটা চাপা কান্না যেন থমকে আছে চোখের আড়ালে।

কি করবে, গৌরী, কিছুই ভেবে পায় না।

স্নান সেরে এসে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে ভাবলে কিছুক্ষণ। আয়নার টেবিলে মা-র সিঁদুরের কৌটোটা খোলাই পড়ে আছে।

এদিক-ওদিক তাকিয়ে কৌটোটা হাত দিয়ে ছুঁলো গৌরী, চিরুনিটা নিয়ে এক মুহূর্ত ভাবলো।

কি করবে গৌরী! অসীমাভর কাছে সত্য গোপন করবে কেন? সব জেনে-শুনে যদি সে গৌরীকে গ্রহণ করতে পারে, তবেই এগিয়ে যাবে তার কাছে, আর, তা যদি না পারে অসীমাভ, তাহলে বুঝবে অসীমাভর প্রেম মিথ্যা, ভালোবাসা মিথ্যা।

কিন্তু সত্যিই কি অসীমাভ ওকে ভালোবেসেছে? এ প্রশ্নের উত্তর জানা নেই গৌরীর।

তাই চিরুনিতে সিঁদুর তুলে নিয়ে সিঁথির কাছে নিয়ে যেতে হাতটা কেঁপে উঠলো। নিচে নামিয়ে রাখলো আবার। না, এত তাড়াতাড়ি খবরটা না জানালেও চলবে।

সময়ের শেষ তীরে এসে পৌঁছয় নি গৌরী। সময় যখন হবে, তখনই না হয় বলবে সে সব কথা।

ব্যাগটা হাতে নিয়ে ধীরে ধীরে সিঁড়ি বেয়ে নেমে আসছিল গৌরী।

সিঁড়ির মুখে হিমানীশের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

একবার থমকে দাঁড়ালো গৌরী।

তারপর স্পষ্ট উচ্চারণে বললে, আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।

হিমানীশ সপ্রশ্ন চোখে তাকালো।—বলো।

কি যেন ভাবলো গৌরী। তারপর ধীরে ধীরে বললে, ফিরে এসে বলবো।

বলেই দ্রুত পায়ে তরতর করে নেমে গেল।

'ডিভোর্স কর না তুই।' গীতার সে রাত্রের কথাটা মনে পড়লো।

'কি করবি কিছু ঠিক করলি? তোর জামাইবাবু জিগ্যেস করছিল।' দিদির কথা।

মাথা ঘুরছে গৌরীর, একটা বিভ্রান্ত ডানা-ভাঙা পাখির মতো ও যেন ভাসতে ভাসতে নেমে আসছে অবধারিত মৃত্যুর দিকে। চোখের সামনে শুধু একটাই আতঙ্ক।

হ্যাঁ, রঞ্জিতের সঙ্গে সম্পর্ক চুকিয়ে দেবে ও। সব, সব।

তারপর, তারপর অসীমাভকে বলবে—আপিসের গেটের সামনে পৌঁছতেই চমকে উঠলো গৌরী।

এ কি চেহারা হয়েছে অসীমাভর? মনে হলো একটা দিনেই তার চেহারা বদলে গেছে। চোখের কোলে নিদ্রাহীন ক্লান্তি। চোখের তারায় উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

গৌরীর জন্যেই বুঝি অপেক্ষা করে দাঁড়িয়ে ছিল অসীমাভ।

হ্যাঁ; গৌরীর জন্যেই। অপেক্ষায় অপেক্ষায় যেন অধৈর্য হয়ে উঠেছিল।

গত দিনের সেই চিঠি, ভারতীদির ঠাট্টা বুঝি বা বিচলিত করে তুলেছিল অসীমাভকে। দিনে দিনে যে স্বপ্ন গড়ে তুলছিল সে মনের একান্তে, একটি ছোট চিঠি সেই স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দিতে চেয়েছে।

গৌরীকে দেখতে পেয়েই তাই দ্রুত কাছে এগিয়ে এলো অসীমাভ। কাঁপা কাঁপা আবেগের কণ্ঠে বললে, আপনার সঙ্গে আমার একটা কথা ছিল।

ক্ষণিকের জন্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলো গৌরী। কি বলবে অসীমাভ, কি বলতে চায়!

অসীমাভর মুখ-চোখের দিকে তাকিয়ে হঠাৎ যেন একটা অস্বস্তি

বোধ করলে গৌরী। ওর গলার স্বর, ওর চোখের করুণ বিষণ্ণতা, ওর শরীরের প্রতিটি রোমকূপ বুঝি কি-এক গোপন কথা প্রকাশ করে বলার জন্যে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। গৌরী বুঝতে পারলো কি বলতে চায় অসীমাভ। আর তাই হঠাৎ যেন ভয় পেলো ও। ভয়? না, এ এক বিচিত্র অনুভূতি। ভয়, লজ্জা, আগ্রহ।

ভিতরে ভিতরে শোনবার জন্যে গৌরী অধীর হয়ে উঠলো। তবু হঠাৎ খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, বেশ তো, দুপুরে টিফিনের সময় শুনবো।

বলে দ্রুত আপিসের লিফ্‌টের সামনে গিয়ে কিউ দিয়ে দাঁড়ালো।

খিলখিল করে হেসে উঠেছিল গৌরী। কিন্তু হাসি নয়। সমস্ত শরীর ওর ভিতরে ভিতরে থরথর করে কেঁপে উঠেছিল।

ঠিক এই দিনটার জন্যেই যেন ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এসেছে ও। স্বপ্ন দেখেছে। কিন্তু আজ এই মুহূর্তে এসে অসীম অস্বস্তিতে বিমূঢ় বোধ করলে। মনে হলো, এই সঙ্কট-মুহূর্ত থেকে পরিত্রাণ পেলেই যেন ভালো ছিল।

নিজের চেয়ারে বসে একখানা ফাইলের উল্টো পিঠ দিয়ে টেবিলের ধুলো ঝাড়লে। মৃদু হেসে পুলিনকে ইশারায় জল দিতে বললে।

কেমন যেন নার্ভাস বোধ করছে গৌরী। গলা শুকিয়ে আসছে। ঢকঢক করে আধ-গ্লাস জল খেয়ে কালি-শুকিয়ে-যাওয়া দোয়াতে একটু জল ঢেলে দিলো।

অন্যদিন নাম সই করে এসে কারো টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে কিছুক্ষণ গল্প করে। মন্দিরার সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রূপ।

আজ আর কোথাও গেল না। নিজের চেয়ারটিতে চুপচাপ

বসে রইলো। চোখ তুলে তাকাতেও ভয়। যদি হঠাৎ অসীমাভর সঙ্গে চোখোচোখি হয়ে যায়! অসহ্য অস্বস্তি।

কাগজপত্র খুলে কাজে ডুবে যাওয়ার ভান করলে। কিন্তু মাথার ভিতর থেকে একটা চিন্তার ভীমরুলকে কিছুতেই যেন সরিয়ে ফেলতে পারছে না ও।

বড়বাবু বাই-ফোকাল চশমার মধ্য দিয়ে একবার তাকালেন গৌরীর দিকে। তারপর নিজের মনেই হাসলেন। হয়তো ভাবলেন, কাজে মন বসেছে মেয়েটার। হয়তো খুশী হলেন।

গৌরীর ওসব দিকে দৃষ্টি নেই। ও তখন ভাবছে, কি বলবে অসীমাভ। যা সন্দেহ করেছে তাই কি! একবার নিজের মনকে বোঝাতে চাইল, না, ও যা ভয় পাচ্ছে তেমন কিছুই নয় হয়তো। সম্পূর্ণ অন্য কিছু বলতে চায় বোধহয়। বুঝি বা বলে বসবে, আরেক-দিন চলুন, দিদিকে আরেকবার বুঝিয়ে বলবেন।

এ কথাটা মনে হতেই সব কিছু বিস্বাদ লাগলো গৌরীর। কেমন এক আশাভঙ্গের দীর্ঘশ্বাস।

গৌরী নিজেই বুঝতে পারে না। তার মনের মধ্যে এমন বিচিত্র অনুভূতি কেন জাগছে। ও যা শুনতে চায়, অসীমাভ সে কথাই বলতে চায় ভাবলেই বুক দুরুদুরু করে ওঠে। অথচ ভিতরে ভিতরে আশঙ্কা, যদি সে-কথা না বলে অসীমাভ!

বার বার দেয়াল-ঘড়িটার দিকে তাকায় গৌরী। অধৈর্য হয়ে ওঠে। কখন টিফিনের সময় হবে, কখন অসীমাভ উঠে এসে ডাকবে ওকে। কি কথা বলবে সে, শোনার জন্যে অধীর হয়ে ওঠে।

ঘড়ির কাঁটা যেন চলছে না। গৌরীর বুকের উপর চেপে বসা ভারী পাথরটা যেন ঘড়ির কাঁটাটাকেও চেপে ধরে আছে।

সমস্ত আপিস জুড়ে কত কথা, হৈ-হট্টগোল, অরিন্দমের সঙ্গে অবনীবাবুর চিৎকার-তর্ক-ঝগড়া, কোনো কিছুই কানে যায় না।

একটা অসীম দুর্ভাবনা সারা বুক জুড়ে আছে। আর কিছু নয় কিংবা আগ্রহ। গৌরী নিজেই ঠিক বুঝে উঠতে পারে না।

এক সময় ভারতীদি আর মন্দিরা ওর কাছে ছুটে এলো।

ভারতীদি হাসলেন।—কি সেই, রঞ্জিৎবাবুর সঙ্গে দেখা হলো ?

মন্দিরা হেসে উঠলো।—এতদিন ডুবে ডুবে জল খাওয়া হচ্ছিল, অথচ আমরা কেউই জানতে পারলাম না !

গৌরী চোখ তুলে তাকালো। কিন্তু ওর মুখে কোনো ভাবান্তর হলো না। যেন ওদের কথাগুলো ওর কানেই যাচ্ছে না।

মন্দিরা বললে, কই, চিঠিটা দেখি না একবার, চিঠি পাওয়ার সৌভাগ্য তো আমাদের হয় না। ভারতীদি নিজেই পড়লে, আমাদের আর দেখালে না ?

গৌরী এবারও কোনো জবাব দিলো না, শুধু ভিতরে ভিতরে জ্বলে উঠলো। ইচ্ছে হলো চিৎকার করে বলে, রঞ্জিৎ আমার কেউ নয়। বলে, রঞ্জিৎ আমার সবই ছিল, আজ কেউ নয়।

তবু বলতে পারলো না। কোনো উত্তর দিতে পারলো না মন্দিরার কথায়।

ওরা ব্যর্থ হয়ে ফিরে গেল।

আর গৌরী ভাবলে, অসীমাভকে আজ সব খুলে বলবে ও। বলবে, রঞ্জিতের সঙ্গে ওর বিয়ের কথা, ওর বিচ্ছেদের ব্যর্থতার কথা। তারপর যা খুশী বলুক অসীমাভ, শুনবে ও। সব শুনেও যদি অসীমাভ ওর হাতে হাত রাখতে পারে, তবেই···

পরক্ষণেই কেমন যেন ভয় পেলো গৌরী।

কি আশ্চর্য ! তবে কি অসীমাভকে সত্যিই ভালোবেসে ফেলেছে গৌরী ? মনের গোপনে কামনা করেছে অসীমাভকে ? তা না হলে, অসীমাভকে সব কথা বলতে ভয় পাচ্ছে কেন ? কেন ভাবছে, সব শুনে অসীমাভ হয়তো পিছিয়ে যাবে ! সরে যেতে চাইবে ওর জীবন থেকে !

মনে মনে অসীমাভকে গ্রহণ করবার জন্যে, না কি নিজেকেই তার কাছে সমর্পণ করার জন্যে উদ্‌গ্রীব হয়ে উঠেছে গৌরী ? আর সে জন্যেই কি পেছনের ইতিহাসটা প্রকাশ করে বলতে ভয় তার ? যদি অসীমাভকে চিরতরে হারাতে হয় !

দিনে দিনে কি ভাবে ওরা কাছে এসেছে, ঘনিষ্ঠ হয়েছে, অসীমাভর সঙ্গ তৃপ্তি দিয়েছে ওকে, একে একে মনে পড়ে যায়।

মনে পর্ড়ে যায় সিনেমা দেখতে যাওয়ার দিনটির কথা।

হঠাৎ একদিন অনুরোধ জানিয়েছিল অসীমাভ। অনুরোধ নয়, যেন অনুনয়।

সিনেমায় যাবার ইচ্ছে ছিল আজ। কোনো রকমে কথাটা উচ্চারণ করেছিল।

গৌরী হেসে বলেছিল, ইচ্ছে যখন গেলেই তো পারেন।

কথাটা শুনে মুখটা চুপসে গিয়েছিল অসীমাভর। ধীরে ধীরে বলেছিল, না, যাবো না।

—কেন ? হেসেছিল গৌরী।

—একা একা সিনেমা দেখতে ইচ্ছে হয় না। অসীমাভ উত্তর দিয়েছিল। তবু স্পষ্ট করে ওর মনের ইচ্ছেটা প্রকাশ করে বলতে পারে নি।

গৌরী মনে মনে কৌতুকবোধ করেছিল। তারপর নিজেই বলেছিল, বেশ তো চলুন না। আমিও যাচ্ছি।

শুনে খুশীতে উচ্ছল হয়ে উঠেছিল অসীমাভর দুই চোখ।

তারপর সেই কেমন অন্ধকারে পাশাপাশি বসে থাকা। অদ্ভুত এক রোমাঞ্চের ঝড় বয়ে গিয়েছিল গৌরীর দেহে মনে।

এক সময় গৌরীর হাতখানার ওপর অসীমাভর হাতখানা এসে পড়েছিল। ভয়-থরথর একখানা আবেগে অধীর হাত। একটি মুখর স্পর্শ। মুখের অনেক কথায় যা প্রকাশ করে বলা যায় না, ঈষৎ স্পর্শের মধ্যে তার চেয়েও বেশী কিছু বলেছিল অসীমাভ। চোখের

ভাষায় যে কথা বলতে পারে নি গৌরী, অসীমাভর হাতের ওপর চাপ দিয়ে বুঝি সেই স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

সেই দৃশ্যটাই মনে মনে রোমন্থন করছিল গৌরী।

হঠাৎ অসীমাভর পায়ের শব্দে চমকে উঠলো।

কখন ওর অজ্ঞাতেই অসীমাভ কাছে এসে দাঁড়িয়েছে, চোখের দৃষ্টিতে অনুনয়ের ভাষা নিয়ে।

চোখ তুলে তাকালো গৌরী, একবার অসীমাভর দিকে, একবার ঘড়িটার দিকে। তারপর নিরুপায় বিষণ্ণতায় উঠে দাঁড়ালো। অসীমাভর পিছনে পিছনে বেরিয়ে এলো।

মন্দিরা দেখছে কিনা, ভারতীদি কোনো কটাক্ষ হানলো কিনা—দেখতে ইচ্ছে হলো না।

ওর সারা শরীর তখন থরথর করে কাঁপছে। কোনো কথা নেই। কোনো প্রশ্ন নেই। যেন মোহগ্রস্তের মতো অসীমাভ ওকে অদৃশ্য কোনো আকর্ষণে টেনে নিয়ে চলেছে।

দম বন্ধ হয়ে আসে গৌরীর। মনে হয়, এখানেই, এই রাস্তার মাঝখানেই বলে ওঠে, আমাদের মাঝখানে বিরাট ফাঁক রয়ে গেছে, একটা বিরাট ফাঁকি। এক চিলতে সিঁদুরের দাগ আমাদের মাঝখানে এক বিভেদের প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

চোখ ঠেলে জল এসে পড়বে যেন এখনই। কোনো পথ খুঁজে পাচ্ছে না গৌরী। কোনো পথ নেই।

একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস চেপে রেখে অসীমাভর পায়ে পায়ে এগিয়ে এলো গৌরী।

কোথায় চলেছে অসীমাভ? গৌরী জানে না, জানতে চায় না। একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্তের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চলেছে ও।

নতুন একটা চায়ের দোকানে গিয়ে ঢুকলো অসীমাভ। একটা খালি কেবিনের সামনে গিয়ে পর্দাটা তুলে ধরলো।

গৌরী ভিতরে ঢুকতেই পর্দা ফেলে দিয়ে বসলো অসীমাভ।

বয় এলো।

হু'কাপ চা দিতে বললো অসীমাভ।

চায়ের পেয়ালা হুটো রেখে গেল বয়।

অসীমাভ চামচটা তুলে নিয়ে পেয়ালায় ডোবালো।

একদৃষ্টে কি চায়ের পেয়ালাটার দিকেই তাকিয়ে আছে অসীমাভ?

একটা হুরন্ত ঝড় থমকে আছে গৌরীর বুকের মধ্যে।

এখনই, এই মুহূর্তে কি ওর গোপন ইতিহাসটা মেলে ধরবে ও?

প্রতিটি মুহূর্ত যেন এক একটা বিরাট সুযোগের ডিঙি হয়ে ভেসে যাচ্ছে ওর নাগালের বাইরে।

মনকে মুঠোর মধ্যে আনবার চেষ্টা করলে গৌরী, কথা গুছিয়ে নিয়ে ও বুঝি কিছু বলতে যাচ্ছিল।

তার আগেই অসীমাভর করুণ কান্নার মতো স্বর শোনা গেল। হুস্থ ভিক্ষুকের গলায় ছাড়া ছাড়া ভাবে অসীমাভ বলে উঠলো, আপনি, আপনি জানেন আমি কি বলতে চাই।

মাথা নিচু করে রইলো গৌরী। কি জবাব দেবে এ-কথার?

কোনো কথা বললে না গৌরী।

অসীমাভর গলায় আবেগ, আনন্দ, ভয় আর লজ্জা।

কাঁপা কাঁপা গলায় অসীমাভ আবার বললে, এর চেয়ে স্পষ্ট করে আর কিছুই বলবার নেই আমার।

গৌরী তখনও চুপ করে আছে। মাথা তুলতে পারছে না ও।

বেশ কিছুক্ষণ অসীমাভও চুপ করে রইলো। তারপর ধীরে ধীরে বললে, জবাব দিন আপনি, চুপ করে থাকবেন না। যা খুশী একটা জবাব দিন।

গৌরী চোখ তুলে তাকাতে পারলো না।

কাঁপা কাঁপা গলায় ও বললে, না, না, আমি—

কথা শেষ করতে পারলে না।

কি বলবে গৌরী? বলবে, সে স্বপ্ন আমিও দেখেছি? বলবে, তার মনও ওই একই কথা বলে?

কিন্তু তার আগে যে আরেকটা গভীর দুঃখের কথা খুলে বলতে হবে তাকে। তার সাদা ধবধবে সিঁথির আড়ালে যে ছিন্ন হৃৎপিণ্ডের রক্তরেখাটুকু লুকিয়ে আছে, সেটুকু মেলে ধরতে হবে অসীমাভর চোখের সামনে।

চেষ্টা করলো গৌরী, কথা খুঁজলো। পারলো না।

আর, আর হঠাৎ ও বলে উঠলো, না, না, আমি যে কিছুই ভাবি নি। শুধু বন্ধুভাবেই দেখেছি আমি আপনাকে। না, না, এ-কথা···

অসীমাভর মুখের চেহারাটা যেন মনের চোখে দেখতে পাচ্ছে গৌরী। দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা বুঝি শুনতে পেলো।

গৌরী বুঝতে পারলো অসীমাভ ভীষণ লজ্জা পেয়েছে। হতাশ হয়েছে। বুঝতে পারলো ওর সামনে উঠে দাঁড়ানো মানুষটা আসলে ভেঙে পড়েছে।

তাই ধীরে ধীরে বললে, কেউ কিছু চেয়ে না পেলে তার দুঃখটাই সবচেয়ে বেশী হয়। কিন্তু···

অসীমাভ বুঝি নেমে দাঁড়িয়েছে এবার।

গৌরীর বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো।

ধীরে ধীরে ও বললে, বিশ্বাস করুন, কেউ চাইলে না দিতে পারাটাও কম দুঃখের নয়।

অসীমাভ শুনলো কথাটা। তারপর ধীর পায়ে কেবিনের পর্দা সরিয়ে বেরিয়ে গেল।

একটু পরে গৌরীও বেরিয়ে এলো। ওর দু'চোখ তখন জলে ভেসে যাচ্ছে। আঁচলে চোখ মুছে আপিসের পথ ধরলো গৌরী।

আর বয়টা পর্দা সরিয়ে কাপ নিতে এসে দেখলে, দু'পেয়ালা চা যেমনকার তেমনি পড়ে আছে। শুধু গৌরীর প্লেটে দামটা রেখে দিয়ে গেছে অসীমাভ।

একটা দিনেই, একটি ছোট ঘটনায় যেন শরীর মন ভেঙে পড়েছে গৌরীর। কেন এমন হলো, যা বলতে চায় নি, চায় না, তা যে কেমন করে ওর মুখ দিয়ে হঠাৎ বের হলো, গৌরী খুঁজে পায় না।

একটি ঘটনাই যেন ওকে রাতারাতি নিঃস্ব নিঃসহায় করে তুলেছে। সব হারিয়ে জীবনের স্রোতে ভেসে যেতে যেতে হাতের কাছে একটা ডিঙি পেয়েছিল, স্বপ্ন গড়েছিল নতুন করে জীবন গড়ে তোলার।

অথচ যে মুহূর্তটির জন্যে অপেক্ষা করেছে দিনের পর দিন, যে মধুর লগ্নটিকে কল্পনার রঙে রাঙিয়েছে নিজেরই মনে মনে, সেই মুহূর্তটির সামনে দাঁড়িয়ে এ কি করে বসলো গৌরী!

ভয়, ভয়! জীবনের একটি ব্যর্থ চিহ্নকে গোপন করতে গিয়েই কি জীবন হারিয়ে গেল? আশ্চর্য! কেন এমন হয়, খুঁজে পায় না গৌরী। বরাবর ও ভেবেছে, মনস্থির করেছে, অসীমাভর কাছে গিয়ে খুলে বলবে ওর গোপন ব্যর্থতার কথা, রঞ্জিতের কথা। তারপর······

না, পারে নি।

যাকে গ্রহণ করতে চায় মনপ্রাণ দিয়ে, তাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে—এর চেয়ে বড় পরিহাস আর কি থাকতে পারে।

পরের দিন সকালে ঘুম থেকে উঠেও একটা যন্ত্রণা। অসীম লজ্জা। কি করে গিয়ে দাঁড়াবে আবার অসীমাভর সামনে, কি করে চোখ তুলে তাকাবে।

আপিসের সময় হয়ে এলো, তখনো বিছানায় পড়ে আছে গৌরী। সারা দেহে কোনো শক্তি নেই, কোনো ইচ্ছে নেই, আশা নেই, আকাঙ্ক্ষা নেই। সব বুঝি শেষ হয়ে গেছে।

হঠাৎ সানাইয়ের একটানা সুরটা কানে ভেসে এলো। কি আশ্চর্য, গৌরীর মনে হলো, এই সুরটা যেন কাল রাত্রেও একবার শুনেছে। শুনেছে কি? স্পষ্ট মনে পড়লো না। আসলে এ-ক'টা দিন ও কিছুই শোনে নি, কিছুই দেখে নি। সমস্ত পৃথিবী ওর কাছে নিশ্চুপ হয়ে গিয়েছিল, সমস্ত পৃথিবী দৃশ্য হারিয়েছিল। শুধু নিজের মনের গভীরতায় ডুবে ছিল গৌরী। আর কোথাও নয়।

সানাই এবার মিঠে সুর ধরেছে, সকালের ঠাণ্ডা বাতাসে-বাতাসে অদ্ভুত এক অনুরণন।

বুক নিঙড়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো। সানাইয়ের সুরটা যেন কান্নার সুর মনে হচ্ছে। আনন্দের নয়।

ধীরে ধীরে মাথা তুলে জানালা দিয়ে বাইরে তাকালো গৌরী। তার পর মুহূর্তেই চমকে উঠে বসলো।

বারান্দায় বেরিয়ে এলো। সামনের রাস্তার ওপারের সেই বাড়িটার ছাদে প্যাণ্ডেল খাটানো হয়েছে। লাল শালুর চাঁদোয়া উঁকি দিচ্ছে, আর ফটকের সামনে রোশনচৌকি। একটানা সুরে সানাই বেজে চলেছে।

মুহূর্তের মধ্যে ওর আপন মনের সমস্ত ব্যথা-বেদনা ধুয়ে-মুছে গেল। নিজেকে ভুলে গেল গৌরী, ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো বুক—গীতা, গীতা কোথায়?

সেদিনের—আরো কতদিনের দৃশ্যের সারি পলকে চোখের সামনে দিয়ে থাপছাড়াভাবে ভেসে গেল।

পড়ার টেবিলের সামনে বসে মোটা একখানা বই খুলে রেখে ওবাড়ির জানালার দিকে সেদিন তাকিয়েছিল গীতা।

গৌরীকে দেখে লজ্জা পেয়েছিল।

আর গৌরী ঠাট্টা করে বলেছিল, কিছু বুঝি না, না?

আরো লজ্জা পেয়েছিল গীতা। আর গৌরী ওকে সাবধান করে দিয়েছিল।

আজ মনে হলো, ভুল করেছে ও। নিজে সাহস পায় নি বলেই গীতাকে সাহস দিতে পারে নি।

তাড়াতাড়ি গীতার পড়ার ঘরে ঢুকলো গৌরী। স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

জানালাটা বন্ধ করে দিয়েছে গীতা। বন্ধ জানালার সামনে টেবিলে মাথা রেখে বসে আছে।

গৌরী ধীরে ধীরে এগিয়ে এলো। তারপর হাল্কা করে গীতার মাথায় হাত রাখলে।

চমকে চোখ তুলে তাকাল গীতা। আর গৌরী দেখলে, গীতার দু'চোখ জলে ভেসে যাচ্ছে। জোয়ারের নদীতে উল্টে যাওয়া দুটো নৌকোর কৃষ্ণাভ ছায়ার মতো গীতার চোখের তারা দুটোও যেন কান্নার জোয়ারে চাপা পড়ে গেছে।

গৌরীর স্নেহস্পর্শে হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠলো গীতা, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে গৌরীকে জড়িয়ে ধরলো।

কান্না, কান্না।

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, আজ আর আপিস যাব না রে।

গীতাকে আজ সারাদিন সঙ্গ দিতে চায় ও, সান্ত্বনা দিতে চায়।

কিংবা কে জানে, হয়তো অসীমাভর চোখের সামনে গিয়ে দাঁড়াতে হবে এই আশঙ্কাতেই, এই লজ্জাতেই গৌরী বললে, আজ আর যাবো না। তোর ভয় নেই, ভয় নেই তোর।

পরের দিন আবার যথারীতি স্নান করে তৈরি হয়ে নিলো গৌরী। আজ আবার আপিস। নিয়ম কারো মনের খবর রাখে না, গোপন লজ্জা আর অস্বস্তি, কিংবা গভীর কোনো ব্যথা-বেদনার খবর রাখে না।

যন্ত্রের মতোই সাজপোশাক পরে তৈরি হয়ে নিলো গৌরী। ঘড়ি দেখে বেরিয়ে পড়লো।

সামনের বাড়ির প্যাণ্ডেল খোলা হচ্ছে, রোশনচৌকি নির্জন নিঃশব্দ। গত রাতের অনেক চিৎকার হট্টগোল শাঁখের আওয়াজ আর সানাইয়ের সুরের আড়ালে একজনের কান্না চাপা পড়ে গেছে। কেউ শুনতে পায় নি। শুধু গৌরী শুনেছে, বুঝেছে, বাধা দেয় নি। কাঁদুক। কান্নার মধ্যেই গীতা হয়তো শান্তি পাবে।

ভিড়ে-ভরা বাসে উঠে পড়লো গৌরী। আপিস।

হাতঘড়িটা দেখলে। দেরি হয়ে গেছে, এত দেরিতে কোনোদিন আপিসে আসে নি গৌরী। তবে কি ওর ভিতরের অনিচ্ছাই ওকে দেরি করিয়ে দিয়েছে?

ধীরে ধীরে আপিস-ঘরে ঢুকলো গৌরী। আর সঙ্গে সঙ্গে বিস্মিত হলো।

বড়বাবুকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে, কি যেন উত্তেজিত আলোচনা চলছে।

প্রথমটা একটু অপ্রতিভ বোধ করলে গৌরী, তারপর উৎকণ্ঠায় বা ঔৎসুক্যে ও এগিয়ে গেল সেদিকে।

বড়বাবু ওকে দেখতে পেয়ে একটু যেন আশার আলো পেলেন।

—আপনি কিছু জানেন? বড়বাবু প্রশ্ন করলেন।

—কি? বুঝতে না পেরে বিভ্রান্তের মতো তাকালো গৌরী।

জয়ন্তীদি বিষণ্নমুখে বললেন, অসীমাভর কথা?

—কি হয়েছে তাঁর? উদ্গ্রীব হয়ে উঠলো গৌরী।

আর বড়বাবু ধীরে ধীরে বললেন, কাল আপিসে আসে নি। আজ এসেই—এই—

একথা না দরখাস্ত এগিয়ে দিলেন বড়বাবু।

মন্দিরা বললে, রেজিগনেশন দিয়েছেন।

রেজিগনেশন! চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন! কেন? সমস্ত শরীরটা আজ যেন টলতে শুরু করেছে গৌরীর।

বড়বাবু দুঃখের হাসি হাসলেন।—জানায় নি। কোনো কারণ দেখায় নি।

একটু থেমে বললেন, আমার ডান হাতটাই যে ভেঙে গেল, এ চিঠি আমি সাহেবকে দেবো কি করে!

বড়বাবু সত্যিই যেন দুঃখ পেয়েছেন। বিচ্ছেদের ব্যথা পেয়েছেন।

গৌরী এক মুহূর্ত স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। তারপর দৃঢ়স্বরে বললে, না। ও চিঠি দেবেন না কাউকে।

বলেই বেরিয়ে চলে গেল।· বিস্ময়ের চোখে সকলেই তাকিয়ে রইলো গৌরীর অপসৃয়মান দেহের দিকে। পরম কৌতূহলে, বিস্ময়ে।

আর বড়বাবু বললেন, আমার বড় ইচ্ছে ছিল, অসীমাভ কমপিটিটিভ পরীক্ষায় পাস করে আমাদের ছোটসাহেব হয়ে আসবে, ওর নিচে কাজ করবো···আমরা তো কেউ কিছু হতে পারলাম না, ও তবু···

গৌরীর এমন চেহারা কখনো দেখে নি অসীমাভ। ক্রোধ? না। ক্রোধ, আক্রোশ, অভিমান, অহঙ্কার? না, অসীমাভ এ মূর্তি কখনো দেখে নি।

অসীমাভর দিদি হাসিমুখে এগিয়ে এলো।—কি আশ্চর্য, এতদিন পরে মনে পড়লো?

না, এ কথার জবাবে হাসতে পারলো না গৌরী। শুধু বললে, আপনার ভাই কোথায়?

দিদি বিস্মিত হলো। ইশারায় ঘরের দিকে দেখিয়ে দিলো।

গৌরী সটান ঘরের ভিতর চলে এলো। তারপর রিনাকে অসীমাভর কাছে দেখতে পেয়ে বললে, তুমি যাও এখন।

অনুরোধ নয়, আদেশ।

রিনা ভয়ে ভয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গৌরী এবার কঠিন স্বরে বললে, এ কি করছেন আপনি, কেন করছেন ?

অসীমাভ বিষণ্ণ হাসি হাসলে।

—উত্তর দিন। কেন আপনি আমাকে এ-ভাবে শাস্তি দিতে চান ?

চোখ তুলে তাকালো অসীমাভ, চোখ নামালো। তারপর অস্ফুট কণ্ঠে বললে, শাস্তি !

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে রূঢ় কিছু একটা বলতে যাচ্ছিল গৌরী। তার আগেই কান্নায় ভেঙে পড়লো।

—হ্যাঁ, শাস্তি। এর চেয়ে বেশী কি শাস্তি আর তুমি আমাকে দিতে পারো !

উত্তেজিত আবেগের স্বরে বললে—সারা জীবন ধরে যদি এই অভিশাপ বয়ে বেড়াতে হয়—আমার জন্য একজনের জীবন নষ্ট হয়ে গেছে—একজন···যার জন্যে আমার নিজের জীবনও ব্যর্থ হয়ে যাবে···

হঠাৎ চোখ তুলে তাকালো অসীমাভ। —গৌরী !

গৌরীর চোখের জল উচ্ছল ঝর্ণার মতো হেসে উঠলো।—সব ভুল বলেছিলাম সেদিন, সব ভুল।

অসীমাভ ধীরে ধীরে বললে, আমাদের কারো জীবনই আমরা ব্যর্থ হতে দেবো না।

হাসল গৌরী।

তারপর ধীরে ধীরে বললে, কিন্তু, কিন্তু আমার জীবনে যে একটা দুর্ঘটনা আছে, সেটুকু···

অসীমাভ এগিয়ে এসে বললে।—থাকে থাক। গৌরীর হাতখানা নিজের মুঠোর মধ্যে তুলে নিয়ে বললে, সে দুর্ঘটনার কথা আমি কোনোদিন জানতে চাইবো না।

কি আশ্চর্য, তবু তো ওর গোপন ইতিহাসটুকু মুখ ফুটে এই

মুহূর্তে বলে দিতে পারতো গৌরী। এই আনন্দের স্রোতে সব গ্লানি হয়তো মুছে যেতো।

কিন্তু না, মুখ ফুটে সে-কথা বলতে পারলো না গৌরী।

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ফিরলো গৌরী। মনের মধ্যে একটা অদ্ভুত আনন্দের গুনগুনুনি।

সিঁড়িতে পা দিয়ে টের পেলো দিদি-জামাইবাবু এসেছে। এত হাসি-হল্লা কেন তবে!

ঘরে ঢুকেই বাচ্চুকে কোলে তুলে নিয়ে চুমোয় চুমোয় ভরে দিল তার গাল।

তারপর কাপড় বদলে এসে দাঁড়াতেই দিদি বললে, শোন।

জামাইবাবু বললে, তোমার সঙ্গে কথা আছে।

দিদির চোখের ইশারায় গায়ত্রী, অঞ্জু, আরতি সরে গেল। গীতা আসে নি। ও বোধহয় চুপচাপ একা একা কোথাও বসে আছে।

হিমানীশ ধীরে ধীরে বললে, কাল উকিল আসবে, এবার যা হোক ব্যবস্থা করে ফেলো। এভাবে···

গৌরী দৃঢ়স্বরে বললে, হ্যাঁ, এবার একটা ব্যবস্থা করতে হয়।

হিমানীশ উঠে এলো। গৌরীর মাথায় হাত রেখে বললে, জীবন এত সহজে শেষ হয় না?

দিদি শুধু বলে উঠলো।—কাব্য রাখো। শোন গৌরী, ভেবে দেখ। হয় রঞ্জিতের কাছে ফিরে যা, আর নয়তো তার সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকিয়ে দে। এ কষ্ট আমাদের কষ্ট।

গৌরী ধীরে ধীরে বললে, চুকেই তো গেছে। শুধু আইনের চোখেই···

হিমানীশ বললে, সে-কথা তোমাকে ভাবতে হবে না। যেমন ভাবে সাজালে ডিভোর্স পাওয়া যাবে, যে ভাবেই হয়···

গৌরী বললে, বেশ। তাই হবে।

বলে উঠে এলো।

আর কিছুক্ষণ পরেই গীতা চুপি চুপি এসে বিষণ্ণমুখে বললে, তোর চিঠি।

গৌরী চিঠিখানা হাত বাড়িয়ে নিলো। রঞ্জিতের চিঠি। না, জামাইবাবু ঠিকই বলেছে। আইনটাই বড়। আইনের চোখে সব চুকেবুকে গেলে বার বার এভাবে বিরক্ত করতো না রঞ্জিৎ। এমনভাবে রাহুর মতো তাকে অনুসরণ করতো না।

চিঠিখানা খুলে পড়লো। রঞ্জিতের কাতর অনুনয়—শুধু একটিবার দেখা করতে চায় সে, আর কিছু নয়। শুধু একটিবার।

নিজের মনেই হাসলো গৌরী। রঞ্জিৎ কি জানে, একটি নতুন কথা সে শুনেছে, নতুন একটি জীবন তার সঙ্গে জড়িয়ে পড়তে চলেছে।

না, আজ আর রঞ্জিৎকে কোনো ভয় নেই। ভয় ছিল বলেই তার সঙ্গে দেখা করতে ঘৃণা বোধ করেছে এতদিন। এড়িয়ে যেতে চেয়েছে। আজ বিচ্ছেদ আর মিলনের মধ্য মুহূর্তে দাঁড়িয়ে সব ভয় দূর হয়ে গেছে।

গৌরী ভাবলে, তাই ভালো। দেখা করবে ও। শেষ কথা জানিয়ে আসবে। বলবে মুক্তি দিলাম। আর পরিবর্তে মুক্তি চেয়ে নেবে ও।

হাল্কা পায়রার মতো উড়ে চলেছে যেন গৌরী। মনের সব ভার নেমে গেছে।

পরের দিন সকালেই বেরিয়ে পড়লো ও। রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করে আসবে। আজ আর তাকে কোনো ভয় নেই।

কড়া নাড়লো। কপাট খুলে দিলো রঞ্জিৎ। সঙ্গে সঙ্গে গৌরীকে দেখে সারা মুখ তার উজ্জ্বল হাসিতে ভরে উঠলো। গৌরী দূরত্বের হাসি হাসলো। যেন বহুদিন আগেকার পরিচিত কোনো মানুষের সঙ্গে একমুহূর্তের জন্যে দেখা হয়েছে।

সব অন্যায় অত্যাচার দিনের পর দিন সহ্য করে এসেছিল গৌরী। চোখের সামনে রঞ্জিৎকে অতলে তলিয়ে যেতে দেখেছে, তবু প্রতিবাদ করে নি।

নিজেকেই দোষ দিয়েছিল সেদিন। ভেবেছিল, গৌরীর মধ্যে রঞ্জিৎ তার স্বপ্নের মানুষকে পায় নি বলেই এমন হয়ে গেছে। তাকে ক্ষমা করতে চেয়েছে গৌরী।

জানতো না, বাবা-মা-বোন—তার শৈশবের সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জ্বালা, ভিতরে ভিতরে গৌরীর বিরুদ্ধে অভিযোগ সৃষ্টি করেছে দিনের পর দিন। আর সে-কথাটা যত স্পষ্ট হয়েছে গৌরীর কাছে ততই যেন নিজেকে ছোট মনে হয়েছে।

যেন রঞ্জিতের কাছে গৌরীর কোনো মূল্য নেই। গৌরী তাকে সুখী করতে পারে না।

নেশায় টলতে টলতে সেদিন ফিরে এসেছিল রঞ্জিৎ।

এতখানি অপমান কোনোদিন কল্পনাও করতে পারে নি গৌরী।

সুটকেসটা তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নিয়ে গৌরী বলেছিল, আমি চললাম।

অট্টহাসি হেসে উঠেছিল রঞ্জিৎ। পাগলের হাসি। তাচ্ছিল্যের হাসি।

তারপর হঠাৎ ক্রুদ্ধ চিৎকারে রঞ্জিৎ বলে উঠেছিল, যাও, ফিরো না, ফিরতে চেয়ো না আর।

স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল গৌরী।

আর রঞ্জিৎ চিৎকার করে বলেছিল, যাও, চলে যাও তুমি। আমাকে শান্তিতে থাকতে দাও। বাবা-মা-আত্মীয়-স্বজন সকলকে হারিয়েছি তোমার জন্যে, ভুল করেছি। তার চেয়ে তোমাকে হারানোই ভালো ছিল।

একটি মেয়ের কাছে এর চেয়ে বড় অপমান আর কি হতে পারে? রঞ্জিৎ কি জানে না, সব কিছু হারাতে হয়েছে রঞ্জিতের নিজেরই

খেয়ালীপনার জন্যে। জানে না, গৌরী কোনো কিছুই হারাতে চায় নি?

আর, আর রঞ্জিতের জন্যে সে-ও কি সব কিছু হারাতে রাজী ছিল না?

না, সে-সব দিনের কথা আজ আর তুলবে না গৌরী। আজ বোঝাপড়া নয়, আজ শুধু শেষ বিদায়ের ভদ্রতা। রাগবে না গৌরী, কোনো প্রশ্ন করবে না, উত্তর চাইবে না।

রঞ্জিৎ অতশত বোঝে না। গৌরী এসেছে, গৌরী দেখা করেছে—এর চেয়ে আনন্দের যেন আর কিছুই নেই।

গৌরী বললে, বলো কি বলবে?

রঞ্জিৎ হাসলো।—একটু বসো, চা খাও। তারপর···

গৌরীর ইচ্ছা হলো রূঢ় গলায় বলে, চা খেতে আমি আসি নি, তোমার আদর-অভ্যর্থনার কোনো প্রয়োজন নেই। তবু বললে না। ও শুধু ভদ্রতা করে যাবে। তারপর, যাবার আগে—

না, রঞ্জিৎ আনন্দে অধীর হয়ে উঠেছে। নিজেই চায়ের কেটলি বসিয়েছে স্টোভে।

বেশ, তাই হোক। মনে করা যাক, পরিচিত একজনের বাড়িতে অতিথি এসেছে গৌরী।

চা খাবে, কথা বলবে, হাসবে।

তারপর—

রঞ্জিৎ চায়ের পেয়ালাটা এনে রাখলে। গৌরী একবারও সাহায্য করতে এগলো না। হাত বাড়ালো না চায়ের পেয়ালাটা নেবার জন্যে।

রঞ্জিৎ আবার বললে, তুমি তো কিছুই খেয়ে আসো নি।

গৌরী হাসলে।—থাক্। পরে হবে।

এইবার সুস্থির হয়ে বসলো রঞ্জিৎ।

রঞ্জিৎ চুপ করে আছে।

গৌরী চুপ করে আছে।

রঞ্জিতের মুখে কথা নেই।

গৌরীর মুখে কথা নেই।

রঞ্জিৎ তাকিয়ে আছে চায়ের পেয়ালাটার দিকে। গৌরী তাকিয়ে আছে চায়ের পেয়ালাটার দিকে।

তারপর একসময় রঞ্জিতের একটা দীর্ঘশ্বাস শোনা গেল।—সব ভুল, ভুল বুঝেছিলাম।

গৌরী কোনো প্রশ্ন করলে না।

রঞ্জিৎ হঠাৎ বললে, তুমি শুনে সুখী হবে গৌরী···

চোখ তুলে তাকালো গৌরী।

রঞ্জিৎ হঠাৎ হেসে উঠলো।—আমি, আমি বদলে গেছি।

একটু থেমে বললে, সব ছেড়ে দিয়েছি।

গৌরী হাসবার চেষ্টা করলো।

আর রঞ্জিৎ গম্ভীর হয়ে বললে, ব্যথার সুরে বললে, তুমি চলে গেলে, ভাবলাম বাবা-মার কাছে ফিরে গেলে শান্তি পাবো। গেলাম···

রঞ্জিৎ চুপ করে রইলো কিছুক্ষণ। তারপর বললে, ভুলবুঝেছিলাম গৌরী। সেখানে শান্তি নেই।

অনর্গল কথা বলে চলে রঞ্জিৎ।—তোমার ওপর আর কারো অধিকার, এতটুকু অধিকারও তখন সহ্য করতে পারতাম না। বাবা-মা-বোন—কারু নয়। মনে হতো, তুমি শুধু আমার।

মনে মনে হাসলো গৌরী। যাবার সময় অসীমাভর কথাটা, ভিতোর্সের কথাটা বলে যাবে—সে-কথা শুনে রঞ্জিৎ কতখানি আঘাত পাবে ভেবে কৌতুকবোধ করলে গৌরী।

চা খেয়ে উঠে দাঁড়ালো ও। জানালার পাশে গিয়ে বাইরের রাস্তার দিকে একবার উঁকি দিলে।

আর সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিৎ ওর পাশে এসে দাঁড়ালো।

রঞ্জিতের স্পর্শও যেন বাঁচিয়ে চলতে চায় গৌরী। আজ আর মনেই হয় না, এই মানুষটাই একদিন তার দেহ-মনের অফুরন্ত ঘনিষ্ঠতা পেয়েছে। এ যেন অচেনা মানুষ, অন্য মানুষ।

কিন্তু, কিন্তু রঞ্জিতের শরীরে বুঝি নতুন করে উন্মাদনা জেগেছে। পুরানো দিনের রক্ত যেন শিরায় শিরায় নেচে উঠতে চাইছে।

রঞ্জিৎ হঠাৎ বলে উঠলো, গৌরী, সকলকে হারিয়েছি তোমার জন্যে। তোমাকে—তোমাকে হারাতে পারবো না।

বলেই গৌরীর হাতখানা চেপে ধরলো রঞ্জিৎ। আর পরমহূর্তের এক ঝটকায় হাতখানা ছাড়িয়ে নিলো গৌরী।

সঙ্গে সঙ্গে রঞ্জিতের মুখের ভাব যেন বদ্‌লে গেল।

কঠিন স্বরে রঞ্জিৎ বললে, তোমার জন্য আমি সব হারিয়েছি গৌরী, সব অন্যায় থেকে নিজেকে সরিয়ে এনেছি। শুধু তোমাকে ফিরে পাবো বলে।

দৃঢ় পদক্ষেপে এগিয়ে এলো রঞ্জিৎ। দু'হাত বাড়িয়ে গৌরীকে জড়িয়ে ধরলে। কাছে টানলে।

—তোমাকে হারাতে পারবো না। ফিসফিস করে বললে রঞ্জিৎ।

গৌরী নিজেকে তার হাত থেকে ছাড়া পেতে চাইলে, থরথর করে কাঁপলো, রাগে জ্বলে উঠতে চাইলো। পারলো না।

গৌরীর নিজেকে বড় অসহায় মনে হলো।

শুধু অনুনয়ের স্বরে বললে—আজ, আজ আমাকে যেতে দাও। লক্ষ্মীটি, আজ যেতে দাও। আমাকে ভাবতে দাও।

সেদিন ভয় পেয়েছিল গৌরী। ঘৃণা আর আক্রোশ রূপান্তরিত হয়েছিল ভয়ে। তাই রঞ্জিতের হাত থেকে পরিত্রাণ চেয়েছিল। মনে হয়েছিল, রঞ্জিতের সঙ্গে দেখা করতে যাওয়াটাই ভুল হয়েছে।

কি প্রয়োজন ছিল তার অনুরোধ রাখার? তবে কি ভিতরে ভিতরে একটা সুপ্ত ইচ্ছাও ছিল তার মনে?

কিন্তু আজ বার বার রঞ্জিতের কথা মনে পড়ছে কেন? যে মানুষটা তার মন থেকে মুছে গিয়েছিল, সে আবার এত স্পষ্ট চেহারা নিয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠছে কেন?

শীত আসছে। বাচ্চুর জন্যে একটা উলের পোশাক বুনে দেবে, বলেছে গৌরী।

আজ রবিবার। কাজ নেই। আর মাথার মধ্যে একরাশ দুশ্চিন্তা। একটা সঙ্কটের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে গৌরী। সেটুকু মন থেকে সরিয়ে দেবার জন্যেই হয়তো কাঁটা আর উল নিয়ে বসেছিল বারান্দায়। মরে-যাওয়া ফুলগাছের টবে পা রেখে দেয়ালে পিঠ দিয়ে উল বুনছিল। কিন্তু মনের মধ্যে দুশ্চিন্তার জট।

ফুলের টবটার দিকে চোখ গেল গৌরীর। বৃষ্টির ছাট লেগে মরা গাছটায় আবার দুটো কচি কচি পাতা গজিয়েছে।

গায়ত্রী এসে দাঁড়িয়েছে রেলিং ধরে।

মেজদি, একটা টাকা দিবি?

গৌরী চোখ তুলে তাকালো।—কেন রে?

আর একটা বোগেনভিলার চারা নিয়ে এসে বসাবো।

গৌরী হাসলো।—ঐ তো পাতা গজিয়েছে আবার।

ওমা, তাইতো,—ছুটে এলো গায়ত্রী। টবের পাশে বসে পড়ে ক্ষুদে ক্ষুদে পাতা দুটোর দিকে তাকালো। হাল্কা আঙুলের স্পর্শ নিলো।

তারপর ছুটে গেল অঞ্জলি-আরতিদের বলতে।

গৌরী তখনো ভাবছে। রঞ্জিতের কাতর অনুনয়ের মুখখানার চেয়ে মনে পড়ছে তার সেই কঠিন দৃঢ়তার আলিঙ্গন। পুরোনো দিনের দৃশ্যগুলো মনে পড়ছে।

—কটা বাজলো রে? গৌরী জিগ্যেস করলো অঞ্জলিকে।

ঘড়িটা দেখে এসে অঞ্জু বললে, ন'টা পনেরো।

আজ রবিবার। সকাল ন'টা পনেরো।

আর আধ ঘণ্টা পরেই বেরোবে গৌরী। অসীমাভ! অসীমাভ অপেক্ষা করবে।

অসীমাভর কথা মনে পড়লেই বড় দুর্বল হয়ে পড়ে গৌরী। বেচারী! গৌরীর জন্যে নিজের জীবনটাই নষ্ট হতে চলেছিল।

না, অসীমাভর জীবন নষ্ট হতে দেবে না সে।

একজন বিশ্বাস নিয়ে তার কাছে এসে দাঁড়াতে চায়, আর একজন অধিকার নিয়ে।

গৌরী তার জীবনের দুর্ঘটনার কথা খুলে বলতে চেয়েছিল অসীমাভকে। কিন্তু, কিন্তু শুনতে চায় নি অসীমাভ।—কোনোদিনই সে-কথা আমি শুনতে চাইবো না।

কিন্তু গৌরী কি শান্তি পাবে নাকি সে-ইতিহাস গোপন রেখে?

দিদি-জামাইবাবু সান্ত্বনা দিয়েছে।—ভাবিস না, সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। আজকাল কতই তো হচ্ছে।

জামাইবাবু স্নেহের স্বরে বলেছে, আইন যখন আছে, তখন সেটা অন্যায় হবে কেন?

ন্যায়-অন্যায়ের কথাই কি ভাবছে গৌরী! ওর মনের মধ্যে যে একটা নতুন ঝড় উঠেছে।

বিয়ের পরের সেই প্রথম দিনগুলির ছবি ভেসে উঠছে। মধুর কয়েকটা স্মৃতি। রঞ্জিৎ—রঞ্জিতের জন্যে সেদিন সব কিছু ছাড়তে রাজী ছিল গৌরী। আর আজ—

রঞ্জিৎ বলেছে, সকলকে হারিয়েছি তোমার জন্যে, কিন্তু তোমাকে হারাতে পারবো না।

কি করবে গৌরী? ও বুঝতে পারছে না, ভাবতে পারছে না।

আজ রবিবার। এখন ন'টা পনেরো মিনিট। হয়তো সাড়ে ন'টা।

রঞ্জিৎ অপেক্ষা করবে। অপেক্ষা করে থাকবে।

আমাকে ভাবতে দাও, ভাবতে দাও আমাকে। রঞ্জিতের হাত থেকে ছাড়া পাবার আশায় বলেছিল গৌরী।

আর রঞ্জিৎ ধীরে ধীরে আলিঙ্গন শিথিল করেছিল। বলেছিল, অপেক্ষা করবো, অপেক্ষা করে থাকবো। কবে আসবে আবার, কবে উত্তর পাবো, বলো?

আজ রবিবার। ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। আর কিছুক্ষণ, তারপরই উঠে পড়বে গৌরী। গিয়ে দাঁড়াবে বাস-স্টপে।

রঞ্জিৎ অপেক্ষা করে আছে, অসীমাভ অপেক্ষা করে আছে।

মনের কাছ থেকে কোনো উত্তর খুঁজে পাচ্ছে না গৌরী।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো গৌরী। উল-কাঁটা তুলে রেখে দিলো।

তারপর আয়নার সামনে এসে দাঁড়ালো।

দুটি বিভ্রান্ত চোখ যেন তন্নতন্ন করে নিজেকেই খুঁজলো।

ঘড়ির কাঁটা এগিয়ে চলেছে। রঞ্জিৎ অপেক্ষা করে আছে, অসীমাভ অপেক্ষা করে আছে।

কার ডাকে সাড়া দেবে গৌরী? কি আশ্চর্য, রঞ্জিতের বিরুদ্ধে আজ আর কোনো আক্রোশ নেই। ভয়? না, তাও নেই।

তাড়াতাড়ি শাড়িটা বদলে নিলো গৌরী। একটু হয়তো সাজলো।

—কি রে মেজদি, ফটো তোলাবি নাকি? গায়ত্রী হেসে প্রশ্ন করলে।

গৌরী কৌতুকের হাসি হাসলো—কেন?

—এত সাজছিস?

গৌরী কোনো জবাব দিলো না।

মনে পড়লো, সেই প্রথম আলাপের দিন। যেদিন রঞ্জিৎ ওর অগুন্তি ফটো তুলেছিল।

ওর বাইরের চেহারাটার কত সুন্দর সুন্দর ছবি তুলে দিয়েছিল রঞ্জিৎ। দেখে মুগ্ধ হয়েছিল গৌরী। আজ যদি কেউ তার মনের

কটো তুলে দিতে পারতো! যদি বলে দিতে পারতো ওর মনের গোপন বাসনাটুকু!

কি আশ্চর্য! ও শুধু ভাবছে, রঞ্জিৎ অপেক্ষা করে আছে, অসীমাভ অপেক্ষা করে আছে।

কিন্তু, ও কার জন্যে অপেক্ষা করে আছে, অপেক্ষা করে ছিল, সে-কথা ভাবছে না কেন? অদ্ভুত লাগে গৌরীর। ও আজ একজনের জীবনকে পরিপূর্ণ করতে পারে, একটি জীবন ব্যর্থ বিভ্রান্ত হতে পারে ওর জন্যে। এত শক্তি ওর এতখানি ক্ষমতা ওর হাতে আছে। অথচ ও নিজে কত দুর্বল। ওর নিজের জীবন কাকে নিয়ে গড়ে উঠতে পারে, বুঝতে পারছে না।

ধীরে ধীরে বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলো গৌরী। একটা দুশ্চিন্তার ভারী পাথর নিয়ে হেঁটে চললো। দুশ্চিন্তা নয়, একটা রহস্যের আধো-আলো আধো-অন্ধকার সুড়ঙ্গপথ বেয়ে এগিয়ে চলেছে ও।

কোথায় গিয়ে পৌঁছবে, পৌঁছতে চায়, ও নিজেই জানে না।

বাস-স্টপে এসে দাঁড়ালো গৌরী। বাস আসছে না, বাস আসছে না।

অসীমাভর জীবন কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? কিন্তু ওর জীবনের অন্ধকার অধ্যায়টা কি করে গোপন রাখবে গৌরী? কেন রাখবে?

মাঝখানে এমন একটা প্রবঞ্চনার বিরাট দেয়াল তুলে কি করে সুখী হবে গৌরী? আর, আর তার এ ইতিহাস প্রকাশ করে বললে, হয়তো এই অন্ধকারটুকু দু'জনের মাঝখানে একদিন মাথা তুলে দাঁড়াতে চাইবে।

আর রঞ্জিৎ? বাইরের মানুষ হয়তো কিছুই জানবে না, বাবা-মা খুশী হবে। দিদি-জামাইবাবু স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বলবে, সেই ভালো। হয়তো গীতা-গায়ত্রীরা মাথা তুলে চলতে পারবে। কিন্তু, কিন্তু একটা জীবন ব্যর্থ করে দেওয়ার অভিশাপ কি সারা জীবন ধরে বয়ে বেড়াতে হবে না গৌরীকে? ওর নিজের মনের গোপনে

লালিত কয়েকটি দিনের মধুর রোমাঞ্চ কি বার বার উঁকি দিয়ে যাবে না ?

না, আর ভাবতে পারছে না গৌরী।

বাস আসছে। উদ্‌গ্রীব হয়ে বাসের নম্বরটা দেখলে গৌরী। ক্রমশ কাছে এসেছে বাসটা। উঠবে? উঠবে ও এই বাসে?

বাস এলো, বাস চলে গেল।

একটার পর একটা বাস এলো, চলে গেল। কোন্ বাসটায় উঠবে, ঠিক করতে পারছে না গৌরী। রঞ্জিৎ, না অসীমাভ—কার কাছে যাবে ও ?

গৌরী তখনও দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে থাকবে।

গৌরীও কি অপেক্ষা করতে থাকবে ?

আরেকটা বাস এসে দাঁড়ালো। আর, তাড়াতাড়ি ভিড় ঠেলে উঠে পড়লো গৌরী। মনের ভার তরতর করে নেমে গেল ওর বুক থেকে।

সামনের আসনে গিয়ে বসতেই এক দমকা ঠাণ্ডা বাতাস এসে লাগলো ওর মুখে-চোখে।
